শ্রীগিরীন্দ্র নাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীসুবোধ চন্দ্র সুর
১১, চৌধুরী লেন, কলিকাতা

চিত্রশিল্পী—
প্রচ্ছদপট—চারু সেন
অন্যান্য চিত্র—চারু সেন ও
মনোমোহন ভট্টাচার্য্য

পরিবর্ত্তিত সংস্করণ—রথযাত্রা, ১৩৪৯ সাল

—সাত আনা

মুদ্রাকর—শ্রীশরৎ চন্দ্র [illegible]
কার্টন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, চৌধুরী লেন কলিকাতা

পৃষ্ঠা

স্বপনচারী	১
বুদ্ধির জয়	১৪
অসৎ কাজের বিপরীত ফল	২৪
সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি	৩৪
শঠে শাঠ্যং	৪৫
বীরবাহুর কেরামতি	৫৫
হনুমানের রসভঙ্গ	৬৯
ভীমনাগের সন্দেশ	৭৩
তার পর ?	৮০

স্বপন চরী

অনিলের বয়স মোটে ছ' বছর। এর মধ্যেই সে চাঁদা মামার আর চাঁদা মামার দেশের কত গল্পই না শুনেছে। সেই সব গল্প শুনে চাঁদা মামার দেশে চাঁদা মামার কাছে যাবার-জন্যে তার হয় খুব ইচ্ছা। তার মা যখন তার ছোট বোনটিকে—'আয় আয় চাঁদ আয়' বলে ঘুম পাড়ান, তখন সে চাঁদ আসবে ভেবে আকাশের দিকে থাকে চেয়ে। কিন্তু কৈ—চাঁদতো আসে না।

অনিল মাকে জিজ্ঞাসা করে, মা, তুমি রোজ চাঁদকে ডাক, কিন্তু চাঁদতো আসে না। মা বলেন, তোমরাই যে

আমার চাঁদ, আর আমার চাঁদে দরকার কি বাবা! কথাটা অনিলের পছন্দ হয় না। অনিল জিজ্ঞাসা করে, মা, চাঁদা মামার দেশে কি যাওয়া যায়? মা বলেন, যায় বৈকি—যারা খুব পুণ্যি করে, তারাই চাঁদের দেশে যেতে পারে। অনিল বলে, মা, সেদিন আমি একজন কাণাকে একটা পয়সা দিয়েছিলুম, আমার তো তাতে পুণ্যি হয়েছে; তা আমি কি চাঁদের দেশে যেতে পারবো? মা হাসেন, আর বলেন, পারবে বৈকি বাবা, চাঁদ যে তোমাদের মত ছোট ছেলেদের বড় ভালবাসেন।

শুনে অনিলের মনে বড় আহ্লাদ হয়। অনিল জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মা, চাঁদা মামার দেশে কি কোরে যাওয়া যায়? মা বলেন, যারা খুব ভাল ছেলে, বাপ-মার কথা শোনে, দুষ্টামি করে না, মন দিয়ে লেখাপড়া শেখে, তাদের জন্যে চাঁদা মামা পক্ষিরাজ ঘোড়া পাঠিয়ে দেন। অনিল জিজ্ঞাসা করে, চাঁদা মামার দেশ কেমন, সেখানে কি আছে মা? মা বলেন, সে চমৎকার দেশ। সেখানে তোমাদের মত কত ছেলে মেয়ে, কত রকম সুন্দর সুন্দর পাখী, হরিণ, ময়ূর, আর কত রকমের যে ফুল ফল পাওয়া যায়, তা বোলে শেষ করা যায় না। সেখানে দুঃখ বলে কিছু নেই, কেবল সুখ। সেখানে কেউ কারুর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করে না কেউ কারুর হিংসে করে না।

অনিল শোনে, আর শুনে চাঁদের দেশে যাবার জন্যে তার মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অনিল জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মা চাঁদের কি কোন দুঃখ নেই?

মা বলেন, আছে বৈকি বাবা, কখন কখন রাহু এসে চাঁদকে গিলে ফেলে। তাই শুনে অনিলের দুঃখ হয়। অনিল জিজ্ঞাসা করে, রাহু কে মা? মা বলেন, রাহু একটা প্রকাণ্ড অসুরের মাথা, চাঁদের সঙ্গে তার চিরকালের বিবাদ।

শুনে অনিলের মনে বড় রাগ হয়। এমন সুখের দেশের চাঁদা মামাকে যে গিলে ফেলে, তাকে মেরে ফেলাই উচিত। অনিল বড় হয়ে একবার চেষ্টা করে দেখবে।

* * *

চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রি। আকাশে চাঁদ হাসছে, চারিদিকে অসংখ্য তারার মেলা। কতকগুলো শাদা আর কালো মেঘ আকাশে ভেসে চলেছে।

অনিল নিজের ঘরে বিছানায় শুয়েছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে কে ডাকলে, অনিল, উঠে এস। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে চাঁদা মামা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

শুনে অনিলের যে কি আহ্লাদ হল, তা বলে বুঝান যায় না। অনিল তাড়াতাড়ি ভাল জামা কাপড় পরে বাইরে এসে দেখলে একটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, তার পিঠে দুই দিকে দুখানি সুন্দর ডানা। অনিলকে দেখে ঘোড়া বললে, নাও আর দেরী ক'র না—আমার পিঠে ওঠে পড়, তাড়াতাড়ি, অনেক দূর যেতে হবে—আমি তোমাকে চাঁদা মামার দেশে নিয়ে

যাব। সেই কথা শুনে অনিল ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল, আর ঘোড়াও অমনি শূন্য পথে উড়ে চলল। কত দেশ, কত পাহাড়, কত নদী, কত সমুদ্র পার হয়ে, শেষে ঘোড়া উপরে আকাশের দিকে উঠতে লাগল। আকাশের মেঘ ছাড়িয়ে, কত ছোট বড় নক্ষত্র পিছনে রেখে ঘোড়া উড়ে চলেছে। অনেকক্ষণ পরে দূরে চাঁদা মামার দেশ দেখা গেল।

একটু পরেই ঘোড়া চাঁদা মামার দেশে গিয়ে থামল, অমনি অনিলও ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চাঁদা মামা হাসতে হাসতে এলেন। সেই সব ছেলেমেয়েদের চেহারা অতি সুন্দর, আর সকলের পিঠেই পাখীর ডানার মত দুখানি করে ডানা।

অনিলকে আসতে দেখে চাঁদা মামা বললেন, এস এস অনিল, আমি ঘোড়া পাঠিয়ে দিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

অনিল বললে, দেখুন মামা বাবু—

অনিলের কথায় বাধা দিয়ে চাঁদা মামা বললেন, আমরা সেকেলে মানুষ, আজও বাবু হতে পারি নি বাবা। চা, চুরুট, চপ, কাটলেট এ সব খেতে না শিখলে, আর হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা না থাকলে তো বাবু হওয়া যায় না। তা সে সব আমাদের কিছুই নেই। সেই জন্যে কেউ আর আমাদের বাবু বলে না, মশাই বলে। তা মামা মশাই কথাটা বেশ মিষ্টি শোনায় না। তুমি শুধু মামা বলেই ডেকো।

অনিল বললে, দেখুন মামা, অনেক দিন থেকে ইচ্ছে যে আপনার কাছে আসব, কিন্তু এতদিন সুবিধে ঘটে নি। আজ আপনি ঘোড়া পাঠিয়ে

সেই দেশের ছেলে মেয়েদের নিয়ে চাঁদা মামা হাস্‌তে হাস্‌তে এলেন

দিয়েছিলেন বলে আসতে পেরেছি। নৈলে আমার মত ছোট ছেলে কি এতদূর আসতে পারে।

চাঁদা মামা এক গাল হেসে বললেন, তা কি পারে বাবা! ছোটরাও পারে না, বড়োরাও পারে না। তবে বড়রা যদি খুব পুণ্যি করে, তা হলে আসতে পারে। কিন্তু সে আলাদা কথা। ছোট ছেলেমেয়েদের আমি বড় ভালবাসি। মায়েরা যখন কচি ছেলেমেয়েদের মুখে চুমো দেবার জন্যে আমায় আদর করে ডাকে, তখন আমার বড় আহ্লাদ হয়। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে তাদের কচি মুখে চুমো খেয়ে আসি। কিন্তু আমার তো যাবার উপায় নেই।

অনিল জিজ্ঞাসা করলে, আপনার যাবার উপায় নেই কেন মামা?

চাঁদা মামা বললেন, আমি যে বড় ঠাণ্ডা বাবা। এই আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ না, বরফের মত কন্ কন্ করছে। তোমাদের গরম দেশে গেলে আমি একেবারে গলে জল হয়ে যাব যে!

অনিল বললে, দেখুন, আমাদের দেশে করাতের গুঁড়ো ঢাকা দিয়ে বরফ রাখে, আর তার ওপর কম্বল চাপা দেয়। তাতে বরফ সহজে গলে না। তা আপনি খুব পুরু করে করাতের গুঁড়ো মেখে, তার ওপর গায়ে খুব গরম জামা দিয়ে চুমো খেয়ে আসতে পারেন তো।

চাঁদা মামা বললেন, তা কি হয় বাবা! আমি গায়ে জামা দিলে পৃথিবী রাত্রে অন্ধকার হয়ে যাবে, পূর্ণিমার চাঁদ আর কেউ দেখতে পাবে না। অনেক ফুল আছে, যে সব ফুল আমার আলোয় ফোটে, সে সব ফুল আর ফুটবে না।

অনিল বললে, তবে আপনার গিয়ে কাজ নেই মামা। আমি তো আপনার দেশে এসেছি, আপনার কাছে থাকব।

চাঁদা মামা বললেন, তা থাকবে বৈকি বাবা, তোমার যতদিন ইচ্ছে ততদিন থাকবে। এখন চল কিছু খাবে, খাওয়া হলে পরে এই সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করবে।

অনিলের খাওয়া হলে চাঁদা মামা বললেন, তুমি এখন খেলা করগে বাবা। আমায় এখন আকাশে উঠতে হবে, চাকরি বজায় রাখা চাই তো।

অনিল বললে, সে কি মামা! আপনার আবার চাকরি কিসের?

চাঁদা মামা বললেন, বোকা ছেলে তাও জান না। আমার চাকরি বারমাস তিরিশ দিন। কেবল অমাবস্যার দিন একটু ছুটি পাই। আপিসের কেরাণীর বরং ছুটি আছে, কিন্তু আমাদের ছুটি নেই। সূয্যি দাদার তো বছরের মধ্যে একদিনও কামাই করবার যো নেই।

অনিল জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা মামা, সূয্যি মামা আপনার দাদা হন?

চাঁদা মামা বললেন, আরে পাগল ছেলে তাও জান না। ওই যে সূয্যি দাদা বললাম। তোমরা সূয্যি মামা আর চাঁদা মামা বল, তা দুই মামা ভাই নয়তো আর কি! বলেই চাঁদা মামা হাঃ হাঃ করে হাসতে লাগলেন।

অনিল বললে, মামা অত হাসছেন কেন? আমি ছেলে মানুষ কিনা, তাই সব কথা এখনও জানিনে। যত লেখাপড়া শিখব, ক্রমে সব জানতে পারব। তা সূয্যি মামার সঙ্গে আপনার ভাব কেমন মামা?

চাঁদা মামা বললেন, সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোরো না বাবা, একেবারে সাপে নেউলে।

অনিল বললে, সে কি কথা, ভাইয়ে ভাইয়ে ভাব নেই!

চাঁদা মামা বললেন, কি করে থাকবে অনিল! আমার দাদাটিকে জানত, সর্ব্বদা মেজাজ গরম, একটু ঠাণ্ডা মেজাজ কোন সময়ে দেখতে পাবে না। শীতকালে বেশীক্ষণ আকাশে থাকতে পান না, তাই মেজাজটা একটু কম গরম বলেই মনে হয়। কিন্তু কেউ বেশীক্ষণ রোদে বসে থাকলেই দাদা তাকে তাতিয়ে তোলেন। দাদাটি আমার পাগল হে পাগল, পাগল ছাড়া আর কি বলব। গ্রীষ্মকালে পাগলামিটে কি রকম বেড়ে ওঠে তা জানতো। পাগল বিষম গরম হয়ে পৃথিবীটে পুড়িয়ে দিতে চায়। গাছপালা সব শুকিয়ে দেয়, খাল, বিল, পুকুরের জল সব শুষে নেয়, ত'তে সব মাছ মরে যায়। সব মাছ যদি মরে যায়, তবে কি খাবে বলতো?

অনিল বললে, ঠিক কথা বলেছেন মামা, আমি তো মাছ নইলে খেতেই পারিনি। সব মাছ মরে গেলে আমরাও না খেয়ে মরে যাব। কিন্তু সূর্য্যি মামা তো সব মাছ মারতে পারেন না।

চাঁদা মামা বললেন, হাঁ, দাদা সব মাছ মারতে পারেন না, পারলে কি আর বাঙালি কেউ বাঁচতো। ছোট ছোট খাল, বিল, পুকুর শুকিয়ে দিয়ে দাদা যখন সে গুলোর মাছ সব মেরে ফেলেন, তখন দাদার বাড়াবাড়ি

দেখে মেঘেরা এসে দাদাকে ঢেকে ফেলে। দাদার আস্পর্দ্ধা একেবারে কমে যায়। এমন কি কখন দুদিন, কখন দশদিন, কখন পনর দিন দাদার আর লোককে মুখ্‌ দেখাবার উপায় থাকে না। তাতো হবেই বাবা, বেশী বাড়াবাড়ি করলে তাকে পড়তেই হবে।

অনিল বললে, আচ্ছা মামা, আপনাদের দুই ভাইয়ে কখন দেখা হয় না?

চাঁদা মামা বললেন, ওরে বাবারে, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা! ভাই কি আমার সে রকম অনিল, বলেছিতো সর্ব্বদাই বিষম গরম। আমি যদি তাঁর কাছে যাই, তা হলে একেবারে গলে যাব, শুধু গলে যাব না ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাব।

অনিল বললে, কিন্তু মামা, আপনার দাদা আকাশে থাকতে থাকতেও তো আপনাকে আকাশে উঠতে দেখেছি।

চাঁদা মামা বললেন, সেটাই ঠিক কথা, চাকরির খাতিরে কখন কখন দাদা আকাশে থাকতেও আমাকে উঠতে হয় বটে। কিন্তু সে দাদা যখন আকাশের পশ্চিম দিকের একেবারে শেষে অস্তে যাবার যোগাড় করেন, তখন আমি আকাশের পূব দিকে ভয়ে ভয়ে উঠি। আমায় দেখে দাদা যে রকম চোখ রাঙান, দেখলেও ভয় করে।

অনিল বললে, আচ্ছা সূর্য্যি মামা যদি আপনাকে মারতে আসেন?

চাঁদা মামা বললেন, ওঃ সে দিকে আমি খুব সাবধানে থাকি। দাদা একটু এগুলেই আমি ছুটে পালিয়ে যাব।
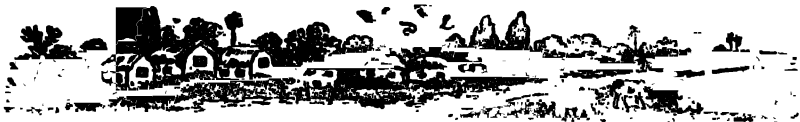
অনিল বললে, আপনার তো পা নেই মামা, ছুটবেন কি করে ?

চাঁদা মামা বললেন, কেন—গড়িয়ে গড়িয়ে। তোমরা যে মার্বেল
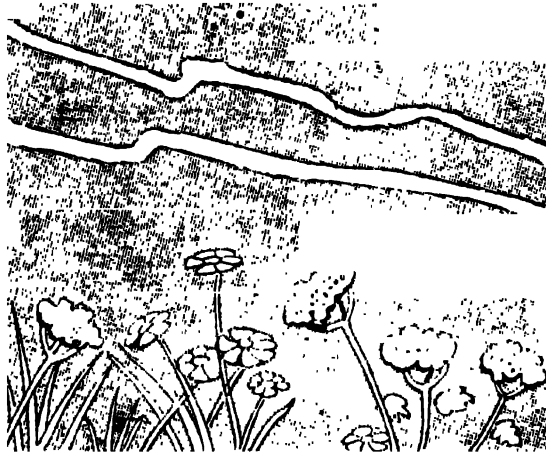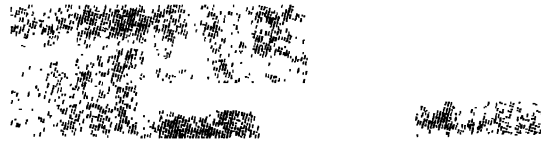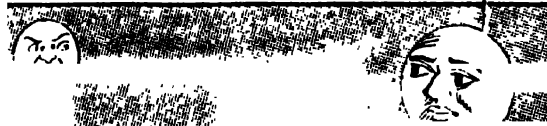
আমায় দেখে দাদা যে রকম চোখ রাঙান, দেখলেও ভয় করে

খেল, সেই মার্বেল যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে ছোটে, আমরা সবাই তেমনি গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটি। তোমরা যে পৃথিবীতে বাস কর, সেও গড়িয়ে গড়িয়ে ছোটে। কিন্তু আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটি বলে, মনে কর না যে আমরা বেশি ছুটতে পারি না। তোমরা পা দিয়ে যে রকম ছুটতে পার, আমরা গড়িয়ে গড়িয়ে তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি ছুটতে পারি। সে যে কি রকম ছুট, তা এখন বুঝতে পারবে না, বড় হয়ে বই পড়ে বুঝতে পারবে।

অনিল বললে, আচ্ছা সূয্যি মামার আপনার ওপর এত রাগ কেন মামা?

চাঁদা মামা বললেন, হিংসে—বাবা হিংসে! সব লোকে আমায় ভালবাসে বলে দাদার বড় হিংসে আমার ওপর। লোকে আমায় আদর করে ডাকে, সুন্দর ছেলে হলে চাঁদের মত ছেলে বলে আমার সঙ্গে তুলনা দেয়, আমায় নইলে কবিদের বই লেখা চলে না। কিন্তু দাদাকে কেউ আদর করে না, সবাই দাদার ওপর চটা। সেই জন্যে আমার ওপর দাদার বড় রাগ।

তার পর চাঁদা মামা চাকরি করতে গেলেন, আর অনিল সেই সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চাঁদা মামার দেশ দেখে বেড়াতে লাগল। কি সুন্দর দেশ! সে দেশের ছেলে মেয়ে, জন্তু, পাখী, ফুল, ফল, পাহাড়, ঝরণা, নদী সবই সুন্দর। সেখানে কুৎসিত কিছুই নেই। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে যখন কষ্টবোধ হতে লাগল, তখন অনিল বললে, চল ভাই এইবার ফিরে যাই।

সকলে মিলে ফিরে আসছে, এমন সময় দূরে একটা প্রকাণ্ড মাথার মত কি দেখা গেল। মাথাটা যেন ক্রমে বড় হয়ে অনিলদের দিকে

পালাও—পালাও, রাহু—রাহু

সরে আসছে। সঙ্গের ছেলে মেয়েরা তাই দেখে ভয়ে ছুটে পালাতে লাগল, আর অনিলকে বললে, পালাও—পালাও, রাহু—রাহু। অনিল

তাড়াতাড়ি ছুটতে গিয়ে পায়ে পা বেধে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠল।

*   *   *

*

অনিলের চীৎকার শুনে তার মা এসে দেখেন, যে অনিল বিছানায় বসে দুই হাতে দুই চোখ রগড়াচ্ছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে বাবা? অনিল কাঁদতে কাঁদতে বললে, চাঁদা মামাকে রাহু খেতে আসছে। মা বুঝতে পারলেন, যে অনিল স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে। তিনি অনিলকে কোলে নিয়ে বললেন, আমি রাহুকে তাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি ঘুমোও। তখন অনিল যেখানে থাকলে শিশুর কোন ভয় থাকে না, সেই মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল।

বুদ্ধির জয়

রাঘবপুরের রামলোচন চাটুয্যে একজন ভাল ঘটক। তিনি ঘটকালি করে অনেক ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, আর সেই জন্যে সারা দেশ জুড়ে তাঁর একটা সুনাম হয়েছে। লোকে জানে, যে রামলোচন ঠাকুরের হাতে ছেলেমেয়ের বিয়ের ভার দিলে, সে বিয়ে হতে বেশী দেরী হয় না। কাজেই লোকের কাছে রামলোচন ঠাকুরের খুব খাতির।

কিন্তু ঘটকালিতে রামলোচন ঠাকুর যেমন খুব চালাক, সংসারের অন্যান্য বিষয়ে তিনি তেমনি খুব বোকা। ঘটকালি করে রামলোচন ঠাকুর টাকাকড়ি

যা পান, সব তাঁর স্ত্রীর হাতে এনে দেন। তাঁর স্ত্রী বেশ বুদ্ধিমতী। স্বামীর রোজগারের টাকায় তিনি বেশ হিসেব করে সংসার চালান, আর তা থেকে দুচারখানা গয়নাও করেছেন। কাজেই ঘটক ঠাকুর আর তাঁর স্ত্রী দুজনে বেশ সুখেই ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা উড়ো বিপদ এসে জুটল।

একদিন সন্ধ্যার পরে ঘটক ঠাকুর ঘরের দাওয়ায় বসে ছিলেন, আর তাঁর স্ত্রী সংসারের কাজকর্ম্ম করছিলেন। এমন সময়ে খুব ভয়ানক গম্ভীর স্বরে বাইরে থেকে কে ডাকলে—ঘটক ঠাকুর বাড়ী আছেন ?

গলার আওয়াজ শুনেই ঘটকের খুব ভয় হল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ভয় পেলেন না। কাজকর্ম্ম ফেলে রেখে, তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাণ্ড বাঘ দরজা ঠেলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকল। ঘটক ঠাকুর বাঘের গলার আওয়াজ শুনেই ভয়ে অস্থির হয়েছিলেন, এখন সেই প্রকাণ্ড বাঘকে বাড়ীর মধ্যে দেখে তিনি ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর একটুও ভয় হল না। তিনি ভাবলেন, বাঘ ঘটক ঠাকুর বাড়ী আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করে বাড়ীতে ঢুকল, তার পর ঘাড় ভাঙবার তার কোন চেষ্টাই নেই। কাজেই এর ভেতর কিছু মজা আছে।

ঘটক ঠাকুরের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, ঘটক ঠাকুরের কাছে কি দরকার বাবা ?

বাঘ বললে, দেখুন, অনেক দিন হল আমার বাঘিনী মরে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি আর বাঘিনী যোগাড় করতে পারছিনে।

ঘটক ঠাকুর তো অনেকের বিয়ে দেন, যদি আমার একটা বিয়ে দিতে পারেন, সেই জন্যে তাঁর কাছে এসেছি।

ঘটকের স্ত্রী বললেন, তার জন্যে আর ভাবনা কি বাপু। উনি এত লোকের যখন বিয়ে দিচ্ছেন, তখন তোমার বিয়েও অনায়াসে দিয়ে দেবেন।

শুনে বাঘ ত মহা খুসি। সে বললে, তা হলে বিয়েটা যাতে একটু শীগ্‌গির হয়, ঘটক ঠাকুর তার ব্যবস্থা করুন।

ঘটকের স্ত্রী বললেন, হাঁ তাই হবে। কিন্তু বিয়ে তো আর অমনি হয় না বাপু, অনেক টাকা লাগে।

তখন বাঘ বললে, টাকা যা লাগে আমি দেব। কত টাকা চাই বলুন?

ঘটকের স্ত্রী বললেন, সে অনেক টাকা। তুমি টাকা আনতে আরম্ভ কর, যখন দরকার মত টাকা যোগাড় হয়ে যাবে, তখন তোমার বিয়ে দেব।

এই রকম বন্দোবস্ত করে বাঘ চলে গেল। ঘটক ঠাকুর তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, বাঘকে তো টাকা আনতে বললে, কিন্তু বাঘ টাকা নিয়ে এলে তার পরে কি হবে? আমি মানুষের বিয়েই দিতে জানি, বাঘের বিয়ে দিতে তো জানি নে। বনে বাঘের জন্যে কনে খুঁজতে গেলে, কনে ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে, আর কনে যোগাড় করে দিতে না পারলে বর ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে। এখন উপায়?

ঘটকের স্ত্রী বললেন, সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না, উপায় আমিই যা হয় করবো। এখন বাঘ টাকা আনুক, মজা করে কালিয়া পোলাও খাও।

এদিকে বাঘ টাকার যোগাড় করবার জন্যে রাস্তার ধারে বনের ভেতরে বসে থাকে, আর কেউ সেই রাস্তা দিয়ে টাকার তোড়া নিয়ে যাচ্ছে দেখলেই, হালুম করে তার সামনে লাফিয়ে পড়ে। তখন লোকটা ভয়ে টাকাকড়ি ফেলে দিয়ে প্রাণপণে ছুটে পালায়, আর বাঘ সেই টাকার তোড়া মুখে করে ঘটকের বাড়ীতে দিয়ে আসে।

এই রকম করে অনেকদিন কেটে যায়। বাঘ তো আর রোজ রোজ টাকার তোড়া আনতে পারে না, মধ্যে মধ্যে আনে। কিন্তু বাঘ যখনই টাকা আনে, ঘটকের স্ত্রী বলেন, এখনও হয়নি, আরও টাকা চাই। শেষে এক দিন বাঘ যখন টাকা নিয়ে এল, ঘটকের স্ত্রী আবার সেই কথাই বললেন। শুনে বাঘের খুব রাগ হল। বাঘ বললে, তোমাদের মতলব কি? আমি এত টাকা এনে দিলাম, তোমরা এখনও বল হয় নি। আমার সঙ্গে জুচ্চুরি।

বেগতিক দেখে ঘটকের স্ত্রী বললেন, আমরা কি আর চুপ করে বসে আছি বাবা, এ দিকের সব যোগাড় ঠিক হয়ে আছে। কি সুন্দরী কনে পাওয়া গেছে, দেখলে তুমি খুব খুসি হবে। তবে সামনের তিনটে দিন ভাল নয় বলে, তিন দিনের পরে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। সেই দিন তুমি এলেই বিয়ে হবে। তবে আরো গোটা কতক টাকা সঙ্গে করে এন।

সুন্দরী কনের কথা শুনে, আর তিন দিন পরে বিয়ে হবে জেনে, বাঘের রাগ পড়ে গেল। সে খুব খুসি হয়ে চলে গেল।

বাঘ চলে গেলে ঘটক ঠাকুর স্ত্রীকে বললেন, এখন উপায়? তিন

বিয়েটা যাতে একটু শীগ্‌গির হয়, ঘটক ঠাকুর তার ব্যবস্থা করুন

দিন পরে বাঘ এসেতো ঘাড় মটকাবে। তার চেয়ে চল এখন আমরা এদেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যাই।

ঘটকের স্ত্রী বললেন, তাতে কি নিস্তার পাবে ? যে বাঘ বন থেকে ঘটকের সন্ধানে ঘটকের বাড়ীতে পর্য্যন্ত আসতে পেরেছে, সেখানেই যাও সে খুঁজে খুঁজে সেই খানেই যাবে।

শুনে ঘটক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মূর্চ্ছা যান আর কি। তখন তাঁর স্ত্রী হেসে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই, বাঘ আমাদের কিছুই করতে পারবে না। এখন যা বলি তা শোন। বাজার থেকে খুব মজবুত দেখে একটা চার হাত লম্বা বস্তা তৈরি করে নিয়ে এস।

স্ত্রীর কথায় সাহস পেয়ে ঘটক ঠাকুর আর মূর্চ্ছা গেলেন না। স্ত্রীর কথা মত একটা মজবুত বস্তা তৈরী করে নিয়ে এলেন।

তিন দিন পরে বাঘ এক তোড়া টাকা নিয়ে হাজির। ঘটকের স্ত্রী মহা আদর করে বাঘকে বসালেন। পূর্ব্বেই লাল নীল কাগজ কেটে বাড়ীটা একটু সাজান হয়েছিল। বাঘ জানতো যে মানুষের বিয়েতে এই রকম করে বাড়ী সাজায়। কাজেই বিয়ে যে হবে, সে বিষয়ে বাঘের আর কোন সন্দেহ রইল না। তার পর ঘটকের স্ত্রী বাঘকে বরণ করলেন। বরণ করার পর একটি নধর পাঁঠা এনে উঠানের এক ধারে বেঁধে রেখে বাঘকে বললেন, বিয়ের আগেতো খেতে নেই, বিয়ে হয়ে গেলে খেয়ে দেয়ে তার পরে বউ নিয়ে বনে যাবে। এই খাবার বাঁধা রইল।

একে বিয়ে, তাতে সামনেই এমন চমৎকার খাবার। বাঘ একেবারে আহ্লাদে আটখানা।

তার পর ঘটক আর তাঁর স্ত্রী দুজনে সেই বস্তার মুখ বাঘের সামনে

বাঘ আর কি করবে, আস্তে আস্তে সেই বস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ল

খুলে ধরলেন। ঘটকের স্ত্রী বললেন, এইবার অধিবাস, অধিবাসের পরেই বিয়ে। এর ভেতরে ঢোকোতো বাবা।

বাঘ বললে, এ রকম অধিবাস তো আমাদের হয় না।

ঘটকের স্ত্রী বললেন, তোমাদের কথা আলাদা, তোমরাতো এ সব কিছু জান না। কিন্তু আমাদের যে সব নিয়ম আছে, সে সব করতে হবে তো। নইলে কোন মানুষই আর আমাদের কাছে বিয়ের জন্যে আসবে না। নাও নাও আর দেরী কোরো না, বিয়ের লগ্ন হয়েছে।

বাঘ আর কি করবে, আস্তে আস্তে সেই বস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তখন ঘটক আর তাঁর স্ত্রী দুজনে মিলে বস্তার মুখ খুব শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললেন। তার পর দুজনে দুটো মোটা লাঠি নিয়ে বস্তাবন্দী বাঘকে দমাদম করে পিটতে আরম্ভ করলেন। বস্তার ভেতর বাঘ ছট্‌ফট্ করতে লাগল, কিন্তু বার হবার উপায় নেই। কাজেই সে পড়ে পড়ে মার খেতে লাগল।

অনেকক্ষণ পিটবার পর ঘটক আর তাঁর স্ত্রী যখন দেখলেন বাঘের আর সাড়া শব্দ নেই, তখন দুজনে সেই বস্তাটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিকটে যে নদী ছিল, সেই নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন।

কিন্তু বাস্তবিক বাঘ মরে নি, বেদম মার খেয়ে জখম হয়ে পড়েছিল। মোটা বস্তার ওপর লাঠির ঘা পড়ার জন্যে তার মাথাও ভাঙ্গে নি। বস্তা টানাটানি করে নিয়ে আসায় বস্তার মুখের বাঁধন আল্‌গা হয়ে গিয়েছিল, আর নদীতে ভাসিয়ে দেবার একটু পরেই সেই মুখ দিয়ে বস্তার ভেতরে জল ঢুকতে লাগল। সেই জল গায়ে মাথায় লাগতে, বাঘ একটু সুস্থ হল।

তখন বস্তার ভেতর বাঘ নড়াচড়া আরম্ভ করলে, আর তার ফলে বস্তার মুখ একেবারে খুলে গেল। মুখ খোলা পেয়ে বাঘ বস্তা থেকে বেরিয়ে পড়ল, তার পর সাঁতার দিয়ে নদীর ধারে গিয়ে উঠল।

যে সুন্দরী বনে

এখন ঘটনা ক্রমে সেখানে বাঘের সঙ্গে এক বাঘিনীর দেখা হল। বাঘিনীর বাঘ মরে গিয়েছিল বলে সেও একটি বাঘ খুঁজছিল। কাজেই বাঘের সঙ্গে সেই বাঘিনীর বিয়ে হয়ে গেল।

বাঘ তখন মনে মনে ভাবলে, হাঁ ঘটক বটে, ঠিক বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। তখন ঘটকের উপর বাঘের আর কিছুমাত্র রাগ রইল না। যে সুন্দরী কনে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাঘের এক বন্ধুর বাঘিনী মরে গেল। অনেক চেষ্টায় বাঘিনী যোগাড় করতে না পেরে, সে এক দিন বন্ধুর কাছে এসে হাজির হল। সে আগেই শুনেছিল, যে এক ঘটক বন্ধুর বিয়ে দিয়েছে। বন্ধু এসে বাঘকে বললে, দেখ বন্ধু, আমি তো কিছুতেই বাঘিনী যোগাড় করতে পারছিনে। এখন ভাবছি, যে ঘটক তোমার বিয়ে দিয়েছেন, সেই ঘটকের কাছে যাব। তা তিনি কি আমার বিয়ে দিতে পারবেন না ?

বাঘ বললে, হাঁ তা পারবেন বৈকি। এই দেখনা, আমার কেমন সুন্দরী কনে জুটিয়ে দিলেন। তবে কথা হচ্ছে কি জান, অধিবাসে টিঁকলে হয়।

এই বাঘটি ঘটকের কাছে গিয়েছিল কিনা, অধিবাসে টিঁকেছিল কিনা, আর তার পরে তার বিয়ে হয়েছিল কিনা, সে খবরটা আমরা পাইনি। তোমাদের যদি জানবার ইচ্ছা আর সাহস থাকে, তা হলে সুন্দর বনের দক্ষিণ দিকের শেষে, হুতুমপুর গ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে, গণ্ডার মারীর জঙ্গলে সেইবাঘের কাছ থেকে জেনে আসতে পার। বাঘটির নাম হচ্ছে বিকটদন্ত। হয়ত বিকটদন্তের ঐ রকম সুন্দরী কনের সঙ্গেও দেখা হতে পারে।

কাজের বিপরীত ফল

একবার হরিপুর গ্রামে ভালুকের বড় উপদ্রব হয়। একটা ভালুক এসে গ্রামের লোকের ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল কতক খায়, কতক নষ্ট করে যায়। লোকে অনেক চেষ্টা করেও ভালুক তাড়াতে বা মারতে পারলে না। শেষে সকলে পরামর্শ করে একটা ফাঁদ তৈরী করলে। সেটা দেখতে চার কোণা খাঁচার মত, আর তা'তে আছে ছোট একটি দরজা। দরজাটি এমন কৌশলে তৈরী, যে ফাঁদের ভেতরে কেউ ঢুকলে দরজা আপনা হতে বন্ধ হয়ে যায়। ফল মূল আর মধুর লোভে ভালুক ফাঁদে ঢুকবে বলে, ফাঁদের

ভেতরে অনেক ভাল ভাল ফল, মূল আর একখানা মৌচাক রেখে দেওয়া হল। ভালুকেরা মধু বড় ভালবাসে।

ফাঁদ পাতবার সঙ্গে সঙ্গেই ভালুক ফাঁদে পড়ে গেল। ফাঁদ থেকে বেরোবার জন্যে সে অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই বেরুতে পারলে না। তখন পাশ দিয়ে কেউ গেলে তাকে ফাঁদের দরজা খুলে দেবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। কিন্তু ভালুকের ভয়ে কেউ আর দরজা খুলে দিলে না। শেষে এক ভাল মানুষ বামুন সেখান দিয়ে যাচ্ছে দেখে, ভালুক অনেক কেঁদে কেটে তাকে দরজা খুলে দিতে বললে। ভালুকের কান্না দেখে বামুনের বড় দয়া হল। বামুন ফাঁদের দরজা খুলে দিলে।

ভালুক ফাঁদ থেকে বেরিয়েই দরজার কাছ থেকে অনেকটা সরে গেল, তার পর বামুনের দিকে ফিরে বললে, বামুন, আমি তোমার নাকটি খাব।

বামুন বললে, সে কি কথা! তুমি ফাঁদে পড়েছিলে, কত কেঁদে কেটে আমায় দরজা খুলে দিতে বললে, আমি দরজা খুলে দিয়ে তোমার প্রাণরক্ষা করলাম, আর এখন তুমি বলছ আমার নাকটি খাবে!

ভালুক বললে, হাঁ খাব, নিশ্চয় খাব, শুধু তোমার নাকটি খাব।

বামুন বললে, নাক গেলে লোকে আমায় খাঁদা বামুন বলে ডাকবে, সে আমি সইতে পারবো না। যদি খেতেই হয়, আমাকে আস্ত খেয়ে ফেল।

ভালুক বললে, আমরা ভালুক জাত, ফল, মূল আর মধু খেয়েই বেঁচে

বামুন, আমি তোমার নাকটি খাব

থাকি। নিতান্ত অভাবে না পড়লে মাংস আমরা খাই না। কিন্তু মানুষের

নাক খেতে আমরা বড় ভালবাসি। বেশ কচ্ মচ্ করে চিবোন যায় কিনা। সেইজন্যে কেবল তোমার নাকটিই খাব।

বামুন বললে, কিন্তু বাপু, এটা কি ধর্ম্ম হল ? আমি তোমার উপকার করলাম, আর তুমি আমার অনিষ্ট করবে ?

ভালুক বললে, হাঁ, এইটেই নিয়ম। যে উপকার করে, লোকে তার অনিষ্টই করে থাকে।

বামুন বললে, একথা আমি স্বীকার করি নে। কেউ উপকার করলে লোকে তার উপকারই করে থাকে, অনিষ্ট করে না।

ভালুক বললে, আচ্ছা, তার প্রমাণ নেওয়া যাক। প্রথমে যে তিনটি প্রাণীর সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, তাদের আমরা জিজ্ঞাসা করব। তারা যদি বলে উপকারীর অনিষ্ট করা উচিত নয়, তা হলে আমি তোমার নাকটি খাব না। আর যদি অন্য রকম বলে, তা হলে আমার এই বড় বড় দাঁত দিয়ে তোমার নাকটি কুট্ করে কেটে নেব।

বামুন ভালুকের কথায় রাজি হয়ে বললে, বেশ তাই হোক।

এমন সময় সেখানে একটা ভেড়া এসে উপস্থিত হল। তখন বামুন ভালুককে বললে, আচ্ছা এই ভেড়া মশাইকে জিজ্ঞাসা করা যাক। তার পর ভেড়াকে বললে, দেখুন ভেড়া মশাই, এই ভালুক ফাঁদে পড়েছিল। আমি ফাঁদের দরজা খুলে দিয়ে ওর প্রাণ রক্ষা করেছি। কিন্তু ভালুক আমার কোন উপকার করা দূরে থাক, আমার নাকটি খেতে চায়। এটা কি উচিত ?

ভেড়া বললে, এটাই উচিত। কেন না লোকে উপকারীর অপকারই

আচ্ছা এই ভেড়ামশাইকে জিজ্ঞাসা করা যাক

ক'রে থাকে। এই দেখুন না, আমাদের গায়ের লোম কেটে নিয়ে লোকে

কম্বল, গরম কাপড়, গরম জামা আরও কত জিনিষ তৈরি করে শীতের কষ্ট থেকে বাঁচে। কিন্তু তার জন্যে কোন উপকার করা দূরে থাকুক, আমাদের কেটে আবার লোকে মাংস খায়। কাজেই লোকে উপকারীর অপকারই করে, এই কথাই ঠিক।

ভেড়ার কথা শুনে বামুন তার কোন জবাব দিতে পারলে না। এমন সময় সেখানে এক গাধা এসে উপস্থিত হল।

ভালুক বললে দেখুন গাধা মশাই—

ভালুকের কথায় বাধা দিয়ে গাধা বললে, মাপ করবেন কর্ত্তা, আমরা মশাই নই, আমরা বাবু। আমাদের পিঠে বোঝা চাপিয়ে বাবুদের কাপড় যায় আসে, আর সেই সব কাপড় পরে বাবুরা বাবু সাজেন। সেই জন্যে আমরাও বাবু খেতাব পেয়ে থাকি।

ভালুক বললে, আচ্ছা সেই ভাল। দেখুন গাধা বাবু, এই বামুন ফাঁদের দোর খুলে দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। এখন আমি বামুনের নাকটি খেতে চাই। তা বামুন বলে, যে কেউ উপকার করলে তার অপকার করা উচিত নয়। আপনার কি মত ?

গাধা বাবু বললেন, বামুনের নাকটি আপনার খাওয়াই উচিত। দেখুন আমরা কত কষ্টে বড় বড় কাপড়ের বোঝা বয়ে বেড়াই। তাইতো বাবুরা বাবু সাজতে পায়, আর ধোপারা পয়সা পায়। যখন আমরা একটু ছুটি পাই তখন মনে বড় আনন্দ হয় কিনা, তাই গান গাইতে ইচ্ছে করে। কিন্তু লোকে

আমাদের গান শুনলেই লাঠি নিয়ে তাড়া করে। উপকারীর প্রতি এ রকম ব্যবহার করা কি উচিত? আপনারা জানেন তো আমাদের গলা কেমন চমৎকার! ভালুক মশাই যদি বলেন, তা হলে একটা গান আপনাদের শুনিয়ে দিই।

ভালুক বললে, গান এখন থাক, গাধা বাবু। আগে বামুনের নাক খাবার একটা ব্যবস্থা হোক। ঐ যে শেয়াল বাবু আসছেন, উনি কি বলেন দেখা যাক।

শেয়াল কাছে আসতেই ভালুক বললে, দেখুন শেয়াল বাবু—

ভালুকের কথায় বাধা দিয়ে শেয়াল বললে, দেখুন ভালুক মশাই, বাবু হতে হলে হয় ভাল জামা কাপড় পরা চাই, নয়তো চাকরি করা চাই। তা আমাদের ভাল জামা কাপড়ও নেই, আর আমরা চাকরিও করিনে। কাজেই আমরা বাবু নই।

বামুন বললে, দেখুন শেয়াল মশাই—

শেয়াল বললে, দেখুন যারা বড়—তা টাকা কড়িতেই হোক, কি বিদ্যেতেই হোক, কি গায়ের জোরেই হোক, তাদের মশাই বলা চলে। যেমন পশুদের মধ্যে বড় বলে, আমরা সিংহ মশাই, বাঘ মশাই, ভালুক মশাই বলি। কিন্তু আমরা তো কিছুতেই বড় নই, কাজেই আমাদের মশাই বলা চলে না। তবে আমাদের কিছু বুদ্ধি আছে বলে, লোকে আমাদের শেয়াল ভায়া বলে।

বামুন বললে, বেশ বেশ শেয়াল ভায়া, তোমরা বুদ্ধিমান বটে, কেননা মিছে গুমর কর না। আজকাল আর ছোট কেউ নেই সবাই বড়, সবাই বাবু,

শুধু বাবু নয় – বড় বাবু। তা এখন দেখ, যদি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পার।

শেয়াল ভালুককে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি ভালুক মশাই ?

ভালুক বললে, দেখ শেয়াল ভায়া, আমি এই ফাঁদে পড়েছিলাম। বামুন আমায় ফাঁদ খুলে বার করে দিয়েছিল। এখন আমি বামুনের নাকটি খেতে চাই, কিন্তু বামুন তাতে নারাজ। বামুন বলে, আমি তোমার উপকার করেছি তুমি আমার অপকার করবে কেন। তা ভেড়া মশাই আর গাধা বাবু দুজনেই বলেছেন, কেউ উপকার করলে তার অপকারই করতে হয়। এখন ভায়ার মত হলেই বামুনের নাকটি আমি খাই।

শেয়াল বললে, দেখুন ভালুক মশাই, সব কথা আমায় ভাল করে বুঝতে হবে, তবে আমি মত দিতে পারব। তা আমার বুদ্ধি কিছু কম। আপনি আর একবার ব্যাপারটা বলুন তো।

ভালুক বললে, আমি এই ফাঁদের মধ্যে পড়েছিলাম, আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আমি অনেক কাঁদাকাটা করতে, বামুন ফাঁদের দোর খুলে দিয়েছিল।

শেয়াল বললে, বুঝেছি, বামুন ছিল ফাঁদের মধ্যে আর আপনি যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে।

ভালুক বললে, তা কেন, আমি ছিলাম ফাঁদের মধ্যে, আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।

শেয়াল বললে, হঁ্যা এইবার বুঝেছি, ভালুক মশাই ছিলেন বামুনের মধ্যে, আর ফঁাদটা পথ দিয়ে যাচ্ছিল।

শেয়ালের বোকামি দেখে ভালুকের রাগ হল। ভালুক বললে, তা নয় রে বোকা শেয়াল, আমি ছিলাম ফঁাদের মধ্যে আর—

শেয়াল বললে, ও আমি বুঝতে পারব না ভালুক মশাই, সে চেষ্টা না করে আপনি বামুনের নাকটি খেয়েই ফেলুন।

ভালুকের তখন খুব রাগ হয়েছে। ভালুক বললে, তোকে বুঝতেই হবে বোকারাম। এই দেখ, এই আমি ভালুক, এই ফঁাদের মধ্যে ছিলাম, আর এই বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল।

শেয়াল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, সে কি ভালুক মশাই, আপনি অত বড় শরীর নিয়ে ফঁাদের মধ্যে ঢুকেছিলেন কি করে?

ভালুক বললে, কেন, যেমন করে ঢোকে!

শেয়াল বললে, সে আমি বুঝতে পারব না, আপনি আর অকারণ দেরী করবেন না।

ভালুক তখন বিষম রেগে গিয়েছে। সে বললে, এই দেখ কি করে ঢোকে। বলে যেমন ফঁাদের মধ্যে ঢুকল, অমনি ফঁাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

তখন শেয়াল বললে, এইবার বুঝেছি ভালুক মশাই, আপনি ফঁাদের মধ্যে ছিলেন, আর বামুন পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তা আমার বিচার এই হল, যে আপনি যেমন ফঁাদের মধ্যে ছিলেন তেমনি থাকুন, বামুন যেমন পথ দিয়ে

যাচ্ছিল তেমনি যাক, আর বামুনের নাকটি আপনার পেটে না গিয়ে বামুনের
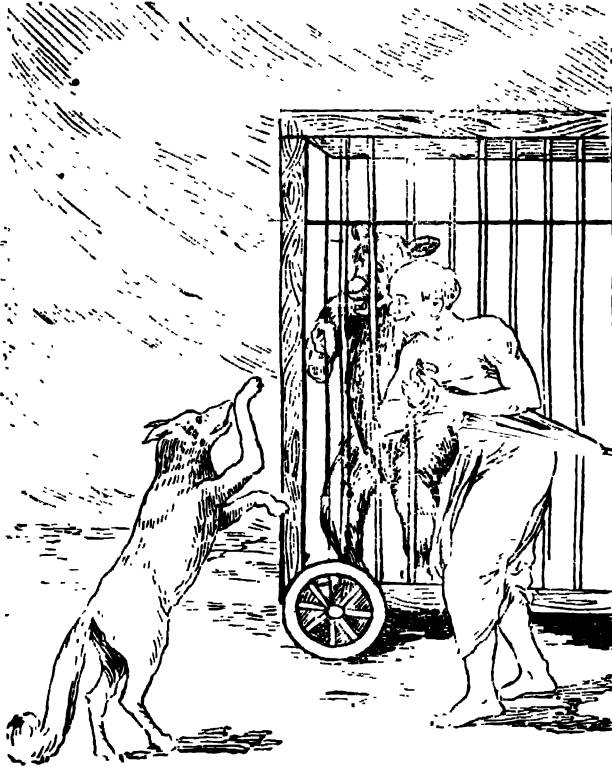
আচ্ছা, এখন আসি তাহলে ভালুক মশাই, নমস্কার

মুখেই থাক। আচ্ছা, এখন আসি তাহলে ভালুক মশাই, নমস্কার

এক সহুরে চোর পাড়াগাঁয়ের দিকে চলেছে, আর এক পাড়াগেঁয়ে চোর সহরের দিকে চলেছে। পথে দুজনে দেখা হল। রতনে রতন চেনে, দুজনে দুজনকে চিনতে পারলে।

সহুরে চোর বললে, ভাই, সহরে পুলিসের বড় কড়াকড়ি, চুরি করবার যোটি নেই। যদি কখন সুবিধে ঘটে যায়, প্রায়ই ধরা পড়তে হয়। তার পরে মার আর জেল। প্রথমে পুরোনো বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম, জেল না শ্বশুর বাড়ী ; ভেবেছিলাম সেখানে গেলে ভাল খেতে পাওয়া যায়। ও বাবা, ভালতো দূরের কথা, চালে ডালে সেদ্ধ। কিন্তু সেটা খিচুড়ি নয়, খিচুনি।

খিচুনি খেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে। তাই পাড়াগাঁয়ের দিকে চলেছি ভাই, যা হোক কলাটা মুলোটা খেতে পাবতো।

পাড়াগেঁয়ে চোর বললে, ভাই, সে গুড়ে বালি। কলাটা মুলোটা এখন আর ভাল জন্মায় না, যদি জন্মায় তার ওপর গাঁয়ের লোকে কড়া পাহারা দেয়। কোন সুযোগে যদি কিছু হাতান যায়, ধরা পড়লে আর নিস্তার নেই। সে যে কি বিষম মার তা বোঝান যায় না। মার খেয়ে আমার হাড়গোড় ভেঙে গেছে। তাই চলেছি সহরের দিকে, যদি একবার কিছু দাঁও মারতে পারি, অনেক দিন চলে যাবে।

দুই চোরে পরামর্শ করে দেখলে সহরেও সুবিধে নেই, পাড়াগাঁয়েও সুবিধে নেই।

সহুরে চোর বললে, ভাই, দুজনে কি করতে পারি এর পর দেখা যাবে। বারো ঘণ্টা পেটে অন্ন নেই, এখন কিছু না খেলে তো বাঁচি নে।

পাড়াগেঁয়ে চোর বললে, তোমার বারো ঘণ্টা, আমার চব্বিশ ঘণ্টা। এখন কি করা যায় তাই বল।

সহুরে চোর পাড়াগেঁয়ে চোরকে কি রকম করতে হবে তা বলে, একটু আগে গিয়ে একটা খাবারের দোকানে ঢুকল। তার পর দোকানির কাছ থেকে ভাল ভাল খাবার নিয়ে খেতে লাগল।

একটু পরেই সেই দোকানে পাড়াগেঁয়ে চোর গিয়ে উপস্থিত। সে দোকানির কাছে কিছু খাবার ভিক্ষে চাইলে, কিন্তু দোকানি দিতে নারাজ।
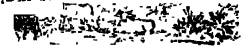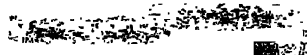
তখন সহুরে চোর বললে, আহা হা, গরিব বেচারিকে কিছু খাবার দাও, আমি দাম দেব। দোকানি তখন তাকে কিছু খাবার দিলে। সহুরে চোর নিজের খাবার থেকেও পাড়াগেঁয়ে চোরকে কিছু খাবার দিতে লাগল।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে সহুরে চোর বললে, কই হে, আমার ভাঙানিটে দাও।

দোকানি বললে আপনি টাকা দিন, তবে তো ভাঙানি দেব। সহুরে চোর চোখ রাঙিয়ে বললে, টাকা তো তোমায় দিয়েছি, ভাল চাও তো আমার ভাঙানি দাও।

এই নিয়ে দুজনে ঝগড়া। শেষে দুজনে গিলে চলল আদালতে হাকিমের কাছে। তার আগে দোকানদার পাড়াগেঁয়ে চোরকে ভাল কাপড় চোপড় দিয়ে সাজিয়ে, ভাল খেতে দিয়ে, তার হয়ে সাক্ষী দেবে বলে ঠিক করে রেখেছিল।

হাকিম সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান বাপু ?

পাড়াগেঁয়ে চোর বললে, ঐ বাবুটি টাকা দিয়েছিলেন, দোকানদার তার ভাঙানি দেয় নি হুজুর।

সাক্ষীর এই কথাতেই মোকদ্দমা শেষ হল। বেচারা দোকানিকে টাকার ভাঙানি দিতে হল, আর দুই চোর খুসি হয়ে চলে গেল।

তার পরে দুই চোরে পরামর্শ করে লোকের বাড়ী চাকরি করতে গেল। সর্ত্ত এই, যে দুজনকেই রাখতে হবে। কিন্তু দুজনকে রাখতে সহজে কেউ

রাজি হল না। শেষে এক বামুন পেটভাতায় দুজনকে রাখতে রাজি হল। একজনের কাজ হল বামুনের একটি গরু ছিল, সেই গরুটিকে চরান; আর একজনের কাজ হল বামুনের বাড়ীর সামনে একটি ছোট আম গাছের দিকে নজর রাখা, আর গাছের তলায় জল ঢালা। কিন্তু যতক্ষণ গাছের তলায় জল না দাঁড়াবে, ততক্ষণ জল ঢালতে হবে। প্রথম দিন সহুরে চোর গরুটিকে নিয়ে চরাতে গেল, আর পাড়াগেঁয়ে চোর গাছের তলায় জল ঢালতে লাগল।

গরুটি ছেড়ে দিতেই সে চার পা তুলে লাফাতে লাগল, আর একবার এর ক্ষেতে পড়ে, একবার ওর ক্ষেতে পড়ে—এমনি করে লোকের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করতে লাগল। যাদের ফসল নষ্ট হল, তারা সহুরে চোরকে গাল দিয়ে মেরে নাস্তানাবুদ করলে।

এদিকে পাড়াগেঁয়ে চোর গাছের তলায় জল ঢালতে লাগল। কিন্তু জল ক্রমাগত শুকিয়ে যায়, গাছের তলা ভাল করে ভেজে না। জল ঢেলে ঢেলে হায়রাণ হয়ে সে ভাবলে, এই বার মা ঠাকরুণের কাছে যাই, হয়ত তিনি কিছু খেতে দেবেন। এই ভেবে সে মা ঠাকরুণের কাছে গিয়ে দেখে, তিনি বসে বসে রাঁধছেন আর চাল কড়াই ভাজা খাচ্ছেন। চোর কাকুতি মিনতি করে বললে—মা ঠাকরুণ, অনেক জল ঢেলে বড় খিদে পেয়েছে, যদি কিছু—

চোরের কথা আর শেষ করতে হল না, মা ঠাকরুণ বাঁ হাতে উনুন থেকে একখানা আধ পোড়া কাঠ নিয়ে তাকে ছুড়ে মারলেন। সে বেচারা ভয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আবার গাছের তলায় জল ঢালতে লাগল।

হুড়োহুড়ি

দুপুর বেলায় দুই চোরে দেখা হল। পাড়াগেঁয়ে চোর সহুরে চোরকে জিজ্ঞাসা করলে, ভাই কাজ কেমন করলি। সহুরে চোর বললে চমৎকার! মাঠে নিয়ে গিয়ে গরুটিকে ছেড়ে দিলাম, গরুটি ক্ষেতের আশে পাশে ঘুরে ঘুরে ঘাস খেতে লাগল, কারুর ক্ষেতের দিকে তাকালেও না। আমি একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় ছায়ায় বসে রইলাম। সেখানে অনেক রাখাল এসে জমা হল। সকলের সঙ্গেই গামছা বাঁধা খাবার। কারুর গামছায় কড়াই ভাজা, কারুর গামছায় পেয়ারা পেঁপে, কারুর গামছায় পাকা আম। সবাই আমায় কিছু কিছু ভাগ দিলে। সেই সব খেয়ে এমন পেট ভরে গেছে, যে ভাত খেতে আর ইচ্ছে নেই। আচ্ছা তোর কাজ কেমন হল বল।

পাড়াগেঁয়ে চোর বললে, কাজ কিছুই নয়। দু কলসী জল ঢালতেই গাছের তলা ভেসে গেল। তার পর মা ঠাকরুণের কাছে গেলাম। মা ঠাকরুণ কত আদর করে চাল কড়াই ভাজা, আর যজমান বাড়ী থেকে কত রকম ফল এসেছিল, সেই সব ফল দিলেন। খেয়ে পেট বোঝাই হয়ে গেল। তার পর পড়ে পড়ে ঘুম দিলাম। এই একটু আগে উঠিছি। তা ভাই শুয়ে বসে পায়ে খিল ধরে গেছে। বিকেলে আমি গরুটিকে নিয়ে মাঠে বেড়াতে যাব, তুই বাড়ী বসে একটু আয়েস করিস।

সহুরে চোর বললে, তা বেশ. তুই মাঠে গিয়ে আয়েস করিস, আমি বাড়ীতে বসে আয়েস করব।

রাত্রে আবার দুজনে দেখা হল। দুজনের চালাকি দুজনেই জানতে

পেরেছে। সহুরে চোর হেসে বললে, ভাই, গরুটি তো সাক্ষাৎ ভগবতী, আর মা ঠাকরুণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। তা এ বাড়ীতে তো একদিনও পোষাবে না। তুই কি বলিস।
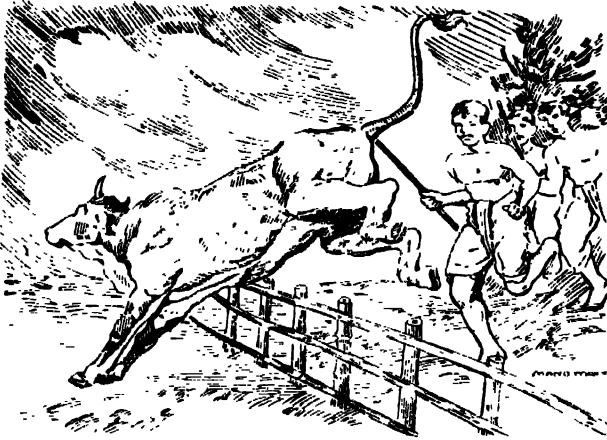
গরুটি সাক্ষাৎ ভগবতী

পাড়াগেঁয়ে চোর বললে, আমিও সে কথা ভেবে রেখেছি। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানিস, বামুন গাছের দিকে ক্রমাগত নজর রাখতে বলে গেল। আর গাছের তলায় জল ঢাললে, কিছুতেই জল দাঁড়ায় না কেন? আমার মনে হয় গাছের তলাটা ফাঁপা, আর সেখানে বামুনের কিছু টাকাকড়ি লুকোনো আছে।

সহুরে চোর বললে, ঠিক বলেচ ভাই, আমারও তাই মনে হচ্ছে। তা দেরি করে কাজ কি, আজ রাত্তিরে।

পাড়াগেঁয়ে চোর বললে, সেই ভাল, আজ রাত্তিরে।

গভীর রাত্রে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোথাও কারও সাড়া শব্দ

মা ঠাকরুণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মী

পাওয়া যাচ্ছে না, তখন দুই চোরে কোদাল নিয়ে সেই আমগাছ তলায় গেল। গাছের গোড়ার চারিদিকে কোদাল ঠুকে দেখলে একটা জায়গা যেন বড় ফাঁপা

বলে বোধ হয়। তখন দুই জনে সেই জায়গাটা খুঁড়তে আরম্ভ করলে। একবার একজন খোঁড়ে, তার পর আর একজন খোঁড়ে, এমনি করে খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় চার হাত গভীর গর্ত্ত হল। এবার সহুরে চোরের পালা। সে গর্ত্তের মধ্যে নেমে খুঁড়তে খুঁড়তে বলে উঠল, পেয়েছি ভাই পেয়েছি, দুটো ঘড়া, দুটো সিকে নামিয়ে দে।

আগে থেকেই সিকে যোগাড় করা ছিল। পাড়াগেঁয়ে চোর তাড়াতাড়ি দুটো সিকে নামিয়ে দিলে। তার পর দুটো সিকে পর পর প্রাণপণে তুলে উপরে নিয়ে এল। তুলে নিয়ে দেখে, একটা সিকেয় সহুরে চোর বসে আছে, আর একটা সিকেয় এক ঘড়া টাকা। সে বললে, তুই যে বললি দুটো ঘড়া।

সহুরে চোর বললে, কিছু মনে কোরো না ভাই, এক ঘড়া টাকা বললে সেই ঘড়াটা তুলে নিয়ে তুমি আমায় মাটি চাপা দিতে তো।

পাড়াগেঁয়ে চোর এক গাল হেসে বললে, সে কি বন্ধু, আমি তোমায় মাটি চাপা দেব, একি একটা কথা হল। আমি বরং তোমায় চুলোয় পোড়াতে পারি, তবু মাটি চাপা দিতে পারিনে। মাটি চাপা দেয় মুসলমানে। আমরা কি মুসলমান?

সহুরে চোর বললে, ঠিক কথা ভাই, তুমি আমার এমনি বন্ধুই বটে। তা যা হোক, এখন আর কথায় কাজ নেই, টাকার ঘড়া নিয়ে সরে পড়ি চল।

তার পর দুই জনে টাকার ঘড়া নিয়ে চলল। পাড়াগেঁয়ে চোরের বাড়ী বেশী দূরে নয় বলে, তার বাড়ীতে গিয়ে টাকাকড়ি দুভাগ করা হল।

শুধু বাড়তি রইল একটা মোহর। সহুরে চোর বললে, মোহর আমার কাছে থাকুক, আমি ভাঙিয়ে তোমাকে অর্দ্ধেক দিয়ে যাব। পাড়াগেঁয়ে চোর বললে, না, মোহর আমার বাড়ীতে যখন ভাগ হয়েছে, তখন মোহর আমার কাছে থাকুক, আমি ভাঙিয়ে তোমাকে অর্দ্ধেক দেব। অনেক কথা কাটাকাটির পর, পাড়াগেঁয়ে চোরের কাছেই মোহর থাকা ঠিক হল। সহুরে চোর তার অর্দ্ধেক ভাগ নিয়ে চলে গেল। পরের দিন বিকালে সে মোহরের দামের অর্দ্ধেক নিয়ে যাবে স্থির হল।

পরের দিন বিকালে সহুরে চোর এসে হাজির। এসে দেখে পাড়াগেঁয়ে চোরের স্ত্রী খুব কাঁদছে। সে জিজ্ঞাসা করলে, কাঁদছ কেন বন্ধুনী? কি হয়েছে?

বন্ধুনী বললে, সর্ব্বনাশ হয়েছে বন্ধু, তোমার বন্ধু আজ সকালে মারা গেছে। শুনে সহুরে চোর হায় হায় করতে লাগল। তার পর বন্ধুনীকে জিজ্ঞাসা করলে, বন্ধুর শব কোথায়? আমি সৎকারের ব্যবস্থা করছি। বন্ধুনী আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে শব কোথায়। সহুরে চোর দেখলে পাড়াগেঁয়ে চোর কাঁথা মাদুর জড়িয়ে বেশ করে মরে আছে। সে তখন বন্ধুনীকে বললে, তুমি কিছু ভেব না বন্ধুনী, আমি বন্ধুর সৎকার করে আসছি।

এই বলে সহুরে চোর পাড়াগেঁয়ে চোরের পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলল। খানিক দূরে একটা বনের মধ্যে গিয়ে সহুরে চোর সেই

দিকে কতকগুলি লোক আসছে দেখতে পেলে। দেখতে পেয়েই সে ভয়ে ভয়ে একটা গাছের ওপর উঠে গেল। পাড়াগেঁয়ে চোর সেইখানেই পড়ে রইল।

এখন যারা আসছিল, তারা ডাকাত, কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকাতি করতে যাচ্ছিল। যাবার সময় পথের পাশে মড়া দেখে, ডাকাতের সর্দ্দার বললে, ভাই সব আজ যাত্রা শুভ, বাম দিকে মড়া। যদি যাত্রার ফল ভাল হয়, ফেরবার সময় মড়াটার সৎকার করে যাব। সর্দ্দারের কথা শুনে সব ডাকাত খুসি হয়ে তার কথায় রাজি হল।

ডাকাতেরা নিকটেই ডাকাতি করে অনেক টাকাকড়ি নিয়ে ফিরে এল। বনের ভেতরে এসে সেই মড়াটাকে দেখে সর্দ্দার বললে ভাই সব, এইবার মড়াটার সৎকার করা যাক। যেমন বলা, অমনি সব ডাকাতেরা গাছ থেকে শুকনো কাঠ ভেঙ্গে নিয়ে এসে একটা চিতা তৈরি করলে। তার পর সেই পাড়াগেঁয়ে চোরকে চিতার উপর শুইয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে।

কিন্তু পাড়াগেঁয়ে চোর মরার ভান করে পড়ে থাকলেও সে মরে নি তো। চিতার আগুনের তাত গায়ে লাগতেই সে হা-হা-হু-হু-হা-হা-হা-হা বিকট শব্দ করে, আর হাত পা বেঁকিয়ে চিতার উপরে উঠে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে গাছের ডাল থেকে হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি শব্দ করে সহুরে চোর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। ডাকাতেরা এই ব্যাপার দেখে ভূত প্রেত ভেবে

টাকাকড়ি সব ফেলে রেখে প্রাণপণে ছুটে পালাল, আর চোর দুজনে

হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা—হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি

সেই সব টাকাকড়ি নিয়ে বাড়ী চলে গেল।

শঠে শাঠ্যং

কালিপুর গ্রামে রমাই পণ্ডিত বলে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। রমাই পণ্ডিত কেবল নামেই পণ্ডিত ছিলেন না, বেশ ভাল রকম লেখাপড়া শিখেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের এমনই দুর্ভাগ্য, যে বিশেষ কিছু উপার্জ্জন হত না। সামান্য কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি আর ঘর কতক যজমান ছিল, তাতেই কোন রকমে দুই বেলা আহার জুটতো।

ব্রাহ্মণের সংসারে স্ত্রী আর একটি ভাই ছাড়া আর কেউ ছিল না। স্ত্রী ব্রাহ্মণের সুখে সুখী, আর দুঃখে দুঃখী ছিলেন। খুব পরিশ্রম করে সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করতেন, সময় মত রেঁধে স্বামী ও দেওরকে খেতে দিতেন, আর সব সময়ে হাসি মুখে থেকে রমাই পণ্ডিতকে সংসারের অভাবের কথা জানতে দিতেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণের ভাইয়ের স্বভাব এর ঠিক উলটো ছিল। সে ছেলেবেলায় ভাল লেখাপড়া শেখে নি, আর এখনও সংসারের

কোন ধার ধারে না। দু-বেলা সময় মত বাড়ীতে এসে খায়, আর অন্য সময়ে লোকের মড়া পোড়ান, রোগীর সেবা করা, কাজ কর্ম্মের বাড়ীতে তদারক করা, আর গান বাজনা করে বেড়ান তার অভ্যাস ছিল। তার নাম ছিল গদাই। পণ্ডিতের ভাই বল্লে লোকে তাকে গদাই পণ্ডিত বলে ডাকত। নির্ভাবনায় থেকে আর সময় মত বেশ খেতে পেয়ে, গদাই পণ্ডিতের শরীর বেশ মোটা সোটা হয়েছিল, আর গায়ে খুব জোরও ছিল।

এই রকমে কিছু দিন যায়, হঠাৎ এক বৎসর দেশে অজন্মা হল, সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে। জমিতে ধান হয় নি, প্রজারা রমাই পণ্ডিতকে ধান দিতে পারলে না; যজমানেরা নিজেরা খেতে পায় না, পুরুতকে দেবে কি। কাজেই রমাই পণ্ডিতের বড় কষ্ট হল, দিন চলা ভার।

স্বামীর শুকনো মুখ দেখে এক দিন রমাই পণ্ডিতের স্ত্রী বললেন, দেখ রামনগরের রাজা পণ্ডিতদের বড় ভালবাসেন। তাঁর সভাতে অনেক পণ্ডিত আছে শুনেছি। তা ছাড়া অন্য ভাল পণ্ডিত তাঁর কাছে গেলে, তিনি তাকে অনেক টাকাকড়ি দেন। তা তুমি তো ভাল লেখাপড়া জান, রাজার কাছে এক দিন যাও না, গেলে বোধ হয় আমাদের আর এত দুঃখ কষ্ট থাকবে না!

কথাটা রমাই পণ্ডিতের বড় পছন্দ হল। তার পর অতি কষ্টে

রাজসভায় যাবার মত পোষাক যোগাড় কোরে, একটা ভাল দিন দেখে রমাই পণ্ডিত রাজার বাড়ীতে চলে গেলেন।

* * * * * * *

রামনগরের রাজা একেবারে মূর্খ ছিলেন, কিন্তু সভায় অনেকগুলি পণ্ডিত রেখে তাঁদের প্রতিপালন করতেন। হঠাৎ এক দিন তাঁর সভায় এক নূতন পণ্ডিত এসে উপস্থিত। তাঁর কপালে লম্বা ফোটা, সর্ব্বাঙ্গে নানা রকম ছাপ, আর মাথায় এক বড় পাগড়ী। তিনি সভায় এসে রাজাকে বললেন, মহারাজ, আমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আপনার সভার পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার করতে চাই। রাজা খুসি হয়ে বললেন, উত্তম কথা, আপনি বিচার করুন। তখন নূতন পণ্ডিত আর আর পণ্ডিতদের দিকে খুব গুমর কোরে চেয়ে বললেন, অন্য শাস্ত্রের কথা থাক, আপনারা কে কোন ব্যাকরণ পড়েছেন বলুন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শুনে রাজসভার পণ্ডিতদের একটু ভয় হয়েছিল। তাঁরা নম্র ভাবে যিনি যে ব্যাকরণ পড়েছেন, তার পরিচয় দিলেন। তখন নূতন পণ্ডিত বললেন, আচ্ছা, জগ্‌দাজগাং সন্ধি বিচ্ছেদ করুন দেখি।

জগ্‌দাজগাং নাম শুনেই পণ্ডিতদের চক্ষু স্থির। কৈ জগ্‌দাজগাং তো কোন ব্যাকরণে নেই। কিন্তু দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যখন বলেছেন, তখন হয়তো কোথাও আছে। এই ভেবে তাঁরা আর কেউ কিছু বলেন না, চুপ করে ভাবতে লাগলেন। তখন নূতন পণ্ডিত মহা আস্ফালন করতে লাগলেন,

রাজাকে বললেন, সামান্য একটা সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারেন না আপনার সভার পণ্ডিতেরা, এ বড় আশ্চর্য্য কথা।

রাজা নূতন পণ্ডিতের বিদ্যের বহর দেখে মহা খুসি। তিনি তাঁকে অনেক টাকাকড়ি দিলেন, আর তাঁর সভাপণ্ডিত করলেন।

সভাপণ্ডিত হয়ে তাঁর নাম হল শতপুটি ভট্টাচার্য্য। শতপুটি অন্য সব পণ্ডিতদের ওপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করলেন, যে অনেক ভাল পণ্ডিত রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। জন কতক নেহাত পেটের দায়ে শতপুটির অত্যাচার সয়েও সভায় রইলেন।

যথা সময়ে রমাই পণ্ডিত রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজসভার নিয়ম হয়েছিল, যে কোন নূতন পণ্ডিত এলে তাঁকে প্রথমে শতপুটির সঙ্গে আলাপ করতে হবে। কাজেই রমাই পণ্ডিত শতপুটির কাছে গিয়ে নিজে এক জন গরিব পণ্ডিত বলে পরিচয় দিলেন, আর অভাবে পড়ে রাজার কাছে এসেছেন, সে কথাও বললেন। শতপুটি যথা নিয়মে রমাই পণ্ডিতের লেখাপড়ার পরিচয় নিয়ে শেষে বললেন, জগ্‌দাজগাং সন্ধি বিচ্ছেদ কর দেখি।

জগ্‌দাজগাং শুনেই রমাই পণ্ডিত ভেবে আকুল। জগ্‌দাজগাং কোন ব্যাকরণে তিনি পান নি, কাজেই ভাববার কথা। রমাই পণ্ডিত চুপ করে আছেন দেখে শতপুটি মহা আস্ফালন করতে আরম্ভ করলেন। রাজাকে

বললেন, একটা সন্ধি বিচ্ছেদ করতে পারে না, সে আবার পণ্ডিত। লোকটা মহামূর্খ, পণ্ডিত সেজে আপনাকে ঠকিয়ে কিছু টাকা নিতে এসেছে। রাজা

জগদাজগাং সন্ধি বিচ্ছেদ কর দেখি

শতপুটিকে মহাপণ্ডিত ভেবে তার কথাই মেনে চলতেন। কাজেই শতপুটির

কথা শুনে তিনি রমাই পণ্ডিতকে কিছুই দিলেন না, বাড়ার ভাগ দারোয়ান দিয়ে রাজসভা থেকে বার করে দিলেন।

অপমানটা রমাই পণ্ডিতের বুকে বড়ই লাগল। তিনি বাড়ীতে ফিরে এসে স্ত্রীকে সব কথাই খুলে বললেন। তার পর বললেন, দেখ, লেখাপড়া শিখে যখন এত অপমান হয়েছি, তখন এ প্রাণ আর আমি রাখবো না। আমার মৃত্যুই ভাল। আমি ঘরের দোর বন্ধ করে না খেয়ে মরবো। তোমরা কেউ আমায় ডেকো না, ডাকলেও আমি দোর খুলবো না।

এই বলে রমাই পণ্ডিত ঘরের ভেতরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলেন। তাঁর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু রমাই পণ্ডিত কিছুতেই দোর খুললেন না। তখন তাঁর স্ত্রী আর কি করেন, ঘরের দাওয়ায় বসে কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় গদাই পণ্ডিত এসে উপস্থিত। গদাই বললে, বৌদি, কি হয়েছে? কাঁদছ কেন? ভাত কই?

রমাই পণ্ডিতের স্ত্রী বললেন, আর ভাই ভাত! তোমার দাদা রাজসভা থেকে অপমান হয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি না খেয়ে মরবেন বলে দোর দিয়ে শুয়ে আছেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও দোর খোলাতে পারলাম না।

এই কথা শুনে গদাই বললে, দাঁড়াও আমি দেখছি। এই বলে গদাই দাদার ঘরের দরজায় বিষম ধাক্কা দিতে লাগল। ধাক্কার চোটে দরজা ভাঙ্গে আর কি!

রমাই পণ্ডিত দেখলেন, দোর না খুললে এখুনি ভেঙে যাবে। অবশ্যি তিনি তো মরবেনই, কিন্তু দরজাটা ভেঙে শুধু শুধু লোকসান করার দরকার কি। এই ভেবে রমাই পণ্ডিত দরজা খুলে দিলেন।

গদাই বললে, দাদা, ব্যাপার কি? না খেয়ে মরবার ইচ্ছা হল কেন?

রমাই পণ্ডিত তখন রাজসভায় তাঁর অপমানের কথা বললেন। শুনে গদাই বললে, দাদা, আমি তোমার মূর্খ ভাই, কিন্তু আজ আমার একটা কথা রাখ। আমি যদি তোমার এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পারি, তখন তুমি না খেয়ে মরো, কিন্তু এখন খাবে চল।

রমাই পণ্ডিত বললেন, সে কি কথা, তুই আমার অপমানের প্রতিশোধ নিবি কি করে?

গদাই বললে, সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না দাদা। বললাম তো, আমি যদি তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পারি, তখন তুমি না খেয়ে মরো। না খেয়ে মরা তো পালাচ্চে না, দুদিন সবুর করে দেখ না কি হয়।

রমাই পণ্ডিত ভাইয়ের কথা শুনে খেতে গেলেন। তার পর যেমন তাদের দিন চলছিল, তেমনি চলতে লাগল।

কিন্তু গদাই এ সময়ে চুপ করে ছিল না। সে অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সেই রাজার, রাজসভার, আর শতপুটির সব খবর নিতে লাগল। শেষে এক দিন সকালে সর্বাঙ্গে ছাপ কেটে, মাথায় এক প্রকাণ্ড পাগড়ী বেঁধে

গদাই এসে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, দাদা, তোমার অপমানের প্রতিশোধ দিতে যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর যেন আমার জয় হয়।

রমাই পণ্ডিত অবাক। তিনি বললেন, ওরে, তুই যে আমার মূর্খ ভাই। সে রাজসভায় পণ্ডিতের কাছে অপমান হতে যাচ্ছিস কেন? তোর অপমান যে আমার প্রাণে আরও বাজবে।

গদাই বললে, ভয় নেই দাদা, আমি মূর্খ বটে, কিন্তু পণ্ডিতের ছেলে, পণ্ডিতের ভাই। আর আমি যাচ্ছি মূর্খের কাছে, পণ্ডিতের কাছে নয়। মূর্খকে জব্দ করতে মূর্খই পারে। তুমি শুধু আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার অপমানের শোধ দিয়ে আসতে পারি।

সেই আশীর্ব্বাদ করেই রমাই পণ্ডিত ভাইকে বিদায় দিলেন। গদাই পণ্ডিতও একেবারে সোজা গিয়ে রাজার সভায় উপস্থিত হল। গদায়ের যণ্ডা চেহারা আর সাজ পোষাক দেখে, শতপুটির কেমন একটু ভয় হল। সে চীৎকার করে বললে, তুমি কে তার দ্বিগুণ চীৎকার করে গদাই বললে, তুমি কে? শতপুটি বললে, আমি শতপুটি ভট্টাচার্য্য। গদাই বললে, আমি সহস্রপুটি ভট্টাচার্য্য। শতপুটি বললে, ব্যাকরণ কিছু পড়া আছে কি?

গদাই বললে, সমস্ত ব্যাকরণ আমার কণ্ঠস্থ? কোন ব্যাকরণ চাও তুমি?

শতপুটি বললে, আচ্ছা, জগ দাজগাং সন্ধি বিচ্ছেদ কর দেখি

যেমন বলা অমনি গদাই শতপুটির গালে একটা বিষম চড় কষিয়ে দিলে। চড় খেয়ে শতপুটি রাগে আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, পাষণ্ড, আমার ন্যায় মহাপণ্ডিতের গণ্ডে চপেটাঘাত।

অমনি গদাই শতপুটির গালে:একটা বিষম চড় কষিয়ে দিলে

গদাই বললে, তুই মহা পণ্ডিত, না মহা মূর্খ। আছে বটে রাক্ষসী

পুরাণে জগ্‌দাজগাং, কিন্তু আগে কচ্‌তাকচাং, খচ্‌তাখচাং, গজ্‌দাগজাং, ঘচ্‌তাঘচাং, চচ্‌তাচচাং, ছচ্‌তাছচাং,—তার পরেতো জগ্‌দাজগাং। তুই একেবারে বলিস জগ্‌দাজগাং।

অন্যান্য যে সব পণ্ডিত রাজসভায় ছিলেন, তাঁরা শতপুটির জ্বালায় এতদিন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সুযোগ বুঝে তাঁরা সকলে বলে উঠলেন, হাঁ হাঁ মহারাজ, ঠিক কথা। আর এইজন্যেই আমরা জগ্‌দাজগাং বুঝে উঠতে পারি নি। উনি নাকি বড় পণ্ডিত, তাই চট করে ধরে ফেলেছেন।

ব্যাপার দেখে শতপুটি বুঝলে, যে তার চালাকি আর চলবে না। কাজেই সে আর কোন কথা না বলে রাজসভা থেকে পালিয়ে গেল। আর রাজা এই শতপুটি-জেতা সহস্রপুটি পণ্ডিতকে তাঁর সভাপণ্ডিত হবার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করলেন।

গদাই বললে, মহারাজ, আমি উদাসীন, তীর্থ ভ্রমণে যাবার সঙ্কল্প করেছি। তবে আমার বড় ভাই পরম পণ্ডিত, আপনি যদি তাঁকে আপনার সভাপণ্ডিত করেন, তা হলে আমি তাঁকে অনুরোধ করলে, তিনি সম্মত হতে পারেন।

রাজা এই পরম পণ্ডিতের বড় ভাইকে অতি আহ্লাদের সহিত সভা-পণ্ডিত করতে রাজি হলেন। তার পর রমাই পণ্ডিত রাজার সভাপণ্ডিত হয়ে পরম সুখে বাস করতে লাগলেন।

বীরবাহুর কেরামতি

পূর্ব্বে বাংলা দেশে অনেক ছোটখাট রাজা ছিল। ঐ সব রাজাদের কিছু কিছু সৈন্য সামন্তও থাকতো, আর পরস্পর ঝগড়া লড়াইও হতো।

আমরা যে রাজ্যটির কথা বলছি, তার নাম ছিল রামপুর। রাজ্যের নাম রামপুর, রাজধানীর নাম রামপুর আর রাজার নাম রামপুরের রাজা।

রামপুর রাজধানীর উত্তর সীমানায় বীরবাহু বলে একটি লোকের বাস ছিল। সংসারে বীরবাহু আর তার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। কিছু জমিজমা আর বাগান পুকুর ছিল, তাতেই বীরবাহুর খাওয়া পরা

এক রকম চলে যেত। বসে বসে জমির ধান, বাগানের ফল আর পুকুরের মাছ খেয়ে বীরবাহুর দেহটি বেশ মোটাসোটা হয়েছিল, কিন্তু গায়ে বেশি জোর ছিল না, আর সে বড় ভীতু ছিল।

কোন কাজের জন্যে বীরবাহু একবার সহর থেকে দূরে কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়েছিল। সেই গাঁয়ে বড় মশার উপদ্রব। সেখান থেকে ফিরে এসে বীরবাহু রাত্রে তার স্ত্রীর সঙ্গে সেই গাঁয়ের মশার কথা বলছিল, কি ভয়ানক মশা গো! এক এক চড়ে পাঁচ পাঁচটা মেরেছি।

সেই সময়ে বীরবাহুর ঘরের পাশ দিয়ে জন কয়েক প্রতিবাসী যাচ্ছিল। তারা মশার কথা শুনতে পায় নি, শুধু এক এক চড়ে পাঁচ পাঁচটার কথা শুনেছিল! তারা ভাবলে, বীরবাহু এক এক চড়ে পাঁচ পাঁচটা মানুষ মেরেছে। তা লোকটা যে রকম ষণ্ডা, সেটা অসম্ভব নয়।

লোকে যে কথা শোনে, সে কথা অন্য কাউকে না বললে তাদের পেটের ভাত হজম হয় না। কাজেই বীরবাহুর এক চড়ে পাঁচটা মানুষ মারার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে সে কথা রামপুরের রাজার কানেও গেল।

ঘটনা ক্রমে এই সময়ে রামপুর রাজ্যে বাঘের উপদ্রব আরম্ভ হল। রাজধানীর উত্তর সীমানার পরেই বন। সেই বন থেকে রাত্রে বাঘ বেরিয়ে নিত্য লোকজন গরুবাছুর মারে, আবার বনের ভেতরে পালিয়ে যায়। লোকে অনেক চেষ্টা করেও বাঘকে তাড়িয়ে দিতে কি মারতে পারলে না। রাজা
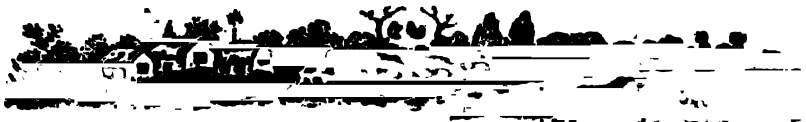
অনেক সেপাইশান্ত্রী পাঠালেন, তারাও কিছু করতে পারলে না। ক্রমে রাজ্যের লোক অস্থির হয়ে উঠল। তারা বলাবলি করতে লাগল, যে রাজা যখন একটা বাঘের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পারলেন না, তখন এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।

রামপুরের রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। প্রজারা যদি চলে যায়, তবে তিনি রাজ্য করবেন কাদের নিয়ে। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্ত্রী, রাজ্য রক্ষার উপায়? তখন হঠাৎ মন্ত্রীর বীরবাহুর কথা মনে পড়ল।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, আপনার রাজ্যে এমন বীর আছে, যে এক চড়ে পাঁচটা মানুষ মারতে পারে। আপনি তাকে এই বাঘ মারবার ভার দিন।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা যেন অকূলে কূল পেলেন। রাজা বললেন, আঃ মন্ত্রী, কি শুভক্ষণেই কথাটা মনে করেছ। এইবার বোধ হয় এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাব। বীরবাহুকে ডাকতে এখনি লোক পাঠাও।

রাজার লোক বীরবাহুকে ডাকতে গেল। রাজা ডাকছেন শুনে বীরবাহুর মহা ভাবনা হল। তাইতো রাজা আবার ডাকেন কেন? তা ভাবনার কথাই বটে। কেননা রাজারা ইচ্ছা করলে হাতে টাকাকড়িও দিতে পারেন, আবার হাতকড়িও দিতে পারেন; পিঠে শাল ঝুলিয়েও দিতে পারেন, আবার বেত মেরে লাল করেও দিতে পারেন। যাই হোক, রাজা যখন ডেকেছেন যেতেই হবে। রাজার লোকের সঙ্গে বীরবাহু রাজসভায় চলে গেল।
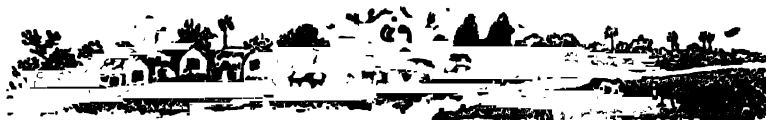
রাজা বীরবাহুকে খুব আদর করে কাছে বসালেন। তার পর বললেন, বীরবাহু, শুনেছি তুমি বড় বীর, এক চড়ে পাঁচটা মানুষ মেরেছ। এখন আমার রাজ্যে যে বাঘ এসেছে, সে বাঘকে তোমায় মারতে হবে। এর জন্যে তোমায় সাত দিন সময় দিলাম। সাত দিনের মধ্যে যদি বাঘ মেরে আনতে পার, তা হলে তোমায় অনেক পুরস্কার দেব, আর যদি না পার, তা হলে কঠিন শাস্তি দেব।

রাজার কথা শুনে বীরবাহুর চক্ষুস্থির। রাত্রিতে ইঁদুর কিচ্‌মিচ্‌ করলে যে ভয় পায়, সে মারবে বাঘ! বাঘ মারা দূরে থাক, বাঘের নাম শুনেই বীরবাহুর বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল।

বীরবাহু, চুপ করে আছে দেখে রাজা বললেন, কি বীরবাহু কথার উত্তর দিচ্ছ না যে?

কিন্তু উত্তর দেবে কে! রাজার হুকুম শুনে ভয়ে বীরবাহুর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। তবে রাজার কথার উত্তর দিতেই হবে, নইলে নিস্তার নেই। বীরবাহু ভাবলে এখন তো স্বীকার হয়ে এখান থেকে চলে যাই, তার পর যা হয় হবে। এই ভেবে বীরবাহু অতি কষ্টে বললে, যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা বললেন, খুব ভাল কথা। সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র যা দরকার হয়, সেনাপতির কাছে চাইলেই পাবে।

বীরবাহু আর একবার—যে আজ্ঞে মহারাজ বলে রাজসভা থেকে চলে গেল।

বীরবাহু চলে গেলে রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্ত্রী, বীরবাহু খালি—যে আজ্ঞে বলে চলে গেল, আরতো কিছু বললে না ?

মন্ত্রী বললেন, যারা বীর পুরুষ তারা মুখে বড়াই করে না, কাজে দেখায়। রাজা বললেন, ঠিক কথা।

এদিকে বীরবাহু বাড়ী এসে স্ত্রীকে সব কথা বললে। স্ত্রী বললে, বাঘ মারতে হবে কি গো ! বাঘের নাম শুনেই যে বুক শুকিয়ে যায়। তার চেয়ে সাত দিনের দিন আমরা এ রাজ্য ছেড়ে পালাই চল।

বীরবাহু বললে, কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি ? বীরবাহুর স্ত্রী বললে, কেন, নদী পার হলেই শ্যামপুর। সেখানকার রাজার সঙ্গে আমাদের রাজার বিবাদ। সেখানে গেলে এ রাজা আর আমাদের কিছুই করতে পারবে না।

দুইজনে পরামর্শ করে এই কথাই স্থির হল। ক্রমে ছয় দিন কেটে গেল। সাত দিনের শেষ দিন রাত্রে রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে বলে, বীরবাহুর স্ত্রী গভীর রাত্রে গোয়ালে গেল। বীরবাহুর একটি গরু ছিল, সেটিকে নিয়ে যেতে হবে তো। পাছে গরু শেষ রাত্রে বেরিয়ে যায় বলে, বীরবাহুর স্ত্রী খুব মজবুত করে গরুর গলায় দড়ি বেঁধে রেখে এল।

ভোর রাত্রে যখন যাবার সব ঠিকঠাক করা হয়েছে, তখন গরু আনবার জন্যে বীরবাহু গোয়ালে গেল। কিন্তু গরু বার করা দূরে থাক, বীরবাহু—ওরে

বাবারে—বলে গোয়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, আর ঘরের ভেতরে গিয়ে

ওরে বাবারে ওরে বাবারে

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল

বীরবাহুর স্ত্রী অবাক। জিজ্ঞাসা করলে বীরবাহু কিছুই বলতে পারে না, কেবল—ওরে বাবারে—ওরে বাবারে করে। শেষে অনেক কষ্টে বীরবাহু যা বললে, তাতে বোঝা গেল যে গোয়ালে গরু নেই, একটা বাঘ শুয়ে আছে।

এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি জান, বাঘটা অন্য জানোয়ার মেরে খুব পেট ভরে মাংস খেয়েছিল। সিংহ প্রভৃতি অনেক হিংস্র জন্তু আছে, যারা ক্ষুধা পেলে অন্য জন্তু মেরে খায়, কিন্তু অকারণ জীবহত্যা করে না। কিন্তু বাঘের স্বভাব সে রকম নয়, পেটভরা থাকলেও অন্য জন্তু দেখলেই বাঘ তাকে মেরে ফেলে। বাঘটা বীরবাহুর গরুটিকে মারবে বলেই গোয়ালে ঢুকেছিল। কিন্তু গরুটি বোধ হয় বাঘ দেখেই ছুটে পালিয়েছিল, আর বাঘের আহারটা এত গুরুতর হয়েছিল, যে গরুর পিছনে ছোটার চেয়ে একটু শুয়ে আয়েস করাই বাঘটা পছন্দ করেছিল। তাই বাঘ সেইখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর বীরবাহুর স্ত্রী গভীর রাত্রে সেই ঘুমন্ত বাঘের গলায় দড়ি বেঁধে রেখে এসেছিল।

বীরবাহুর স্ত্রী সেই কথা শুনে প্রথমেই গোয়াল ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। তার পর বীরবাহুকে ঠাণ্ডা করে বললে, আর আমাদের পালাতে হবে না। আমি বাঘের গলায় বেশ মজবুত করে দড়ি বেঁধেছি, বাঘ আর কিছুতেই পালাতে পারবে না। তুমি রাজার কাছে খবর দিয়ে এস। তার পর রাজাকে কি বলতে হবে, দুইজনে পরামর্শ করে সেটাও স্থির করা হল।
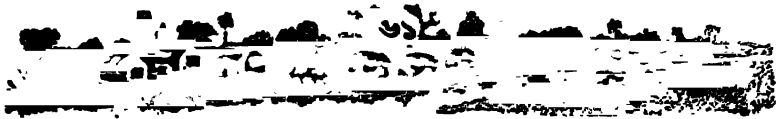
একটু বেলা হতেই বীরবাহু রাজসভায় গিয়ে হাজির। তাকে দেখেই রাজা বললেন, কৈ বীরবাহু, বাঘ কৈ? তোমায় সাত দিন সময় দিয়েছিলাম, আজ তার শেষ দিন মনে আছে তো?

বীরবাহু হাত যোড় করে বললে, খুব মনে আছে মহারাজ। আপনার এই দরিদ্র প্রজা রাজকার্য্যে কখন অবহেলা করে না, এটা নিশ্চিত জানবেন। আপনার সৈন্যসামন্তরা দু-তিন মাসে যে কাজ করতে পারে নি, আপনার এই অধম প্রজা সাত দিনেই সে কাজ শেষ করেছে।

রাজা শুনে মহা খুসি হলেন। রাজসভায় হুলস্থূল পড়ে গেল। রাজা ব্যস্ত হয়ে বললেন, কৈ বাঘ, কোথায় বাঘ? রাজসভার সকলেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কৈ বাঘ, কত বড় বাঘ, কেমন বাঘ?

বীরবাহু বললে, মহারাজ, আমি সামান্য একটা বাঘ মেরে বাহাদুরি নিতে চাইনে। তাই বাঘকে ধরে এনে আমার গোয়ালে বেঁধে রেখেছি। পাপীর শাস্তি রাজা দেবেন। বাঘকে বন্দী করে রাখুন বা মেরে ফেলুন, আপনার বিচারে যা হয় করুন।

তখন রাজা বীরবাহুর বাড়ীতে অনেক লোক জন পাঠিয়ে দিলেন। তারা গোয়ালের জানালার ভেতর দিয়ে বল্লম চালিয়ে বাঘটাকে মেরে রাজসভায় নিয়ে গেল। রাজ্যের লোক দলে দলে বাঘ দেখতে এল, আর সকলেই বীরবাহুর খুব সুখ্যাতি করতে লাগল। তার পর রাজা বীরবাহুকে অনেক টাকাকড়ি পুরস্কার দিলেন।

এর পর কয়েক বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন রাজার কাছে খবর এল, যে নদীর ওপারের শ্যামপুরের রাজা রামপুর রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। তাঁর অনেক সৈন্য নদীর ওপারে জমায়েত হয়েছে। শ্যামপুরের রাজার মত অত বেশী সৈন্য রামপুরের রাজার ছিল না। কাজেই রাজা মহা ভাবনায় পড়লেন। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্ত্রী এখন উপায় ? এ বিপদে উদ্ধার পাই কি করে ?

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, যে বীর জ্যান্ত বাঘ ধরে আনতে পারে, সে সোজা লোক নয়। আপনি বীরবাহুকে ডাকান।

মন্ত্রীর পরামর্শ রাজার ভারি পছন্দ হল। তিনি তখনি বীরবাহুকে ডাকতে লোক পাঠালেন। বলে দিলেন, যেন বীরবাহু কিছুমাত্র বিলম্ব না করে রাজসভায় আসে।

রাজার হুকুম শুনে বীরবাহুর বিষম ভয় হল। বীরবাহু ভাবলে, আবার বাঘ এসেছে নাকি। এবার বাঘ ধরতে বললে গেছি আর কি। কিন্তু উপায় নেই, রাজার হুকুম। ভয়ে ভয়ে বীরবাহু রাজসভায় গিয়ে হাজির হল।

বীরবাহুকে দেখে রাজা ভারি খুসি। বললেন, দেখ বীরবাহু, শ্যামপুরের রাজা আমার রাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। তার অনেক সৈন্য নদীর ওপারে জমায়েত হয়েছে। তুমি বীর পুরুষ, ঐ সমস্ত সৈন্য তাড়িয়ে দিয়ে আমার মান রক্ষা কর। আমার যে সব সৈন্য আছে তোমায় তাদের সেনাপতি করলাম। আর ঘোড়াশালা থেকে তোমার পছন্দ মত ঘোড়া বেছে নাও।

রাজার হুকুম শুনে বীরবাহুর বিষম ভয় হল। বীরবাহু ভাবলে, বাবা, এইবার গেছি। সৈন্যদের কাছে এগুলে এক বল্লমের খোঁচায় আমার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে। এখন উপায়?

বীরবাহু কথা বলে না দেখে রাজা আবার বললেন, কি বীরবাহু, চুপ করে রইলে যে? তুমি বীর, বীরের উপযুক্ত কাজ কর। তোমায় এত সোণা, হীরে, মুক্ত পুরস্কার দেব, যে তোমার সারা জীবন সুখে কেটে যাবে। আর যদি এ কাজ করতে রাজি না হও, তা হলে কঠিন শাস্তি দেব।

বীরবাহু ভাবলে আমি তো মরিইছি, কিন্তু এখনি রাজার হাতে মরি কেন? এখন তো বাঁচি, তার পর যা হয় হবে। এই স্থির করে বীরবাহু বললে, মহারাজ নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনার শত্রু বিনাশ করে আসছি।

বীরবাহুর কথা শুনে সকলেই মহা খুসি। রাজসভায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। রাজা আতর পান দিয়ে বীরবাহুকে সম্মান করলেন। তার পর অনেক লোক বীরবাহুকে ঘিরে নিয়ে ঘোড়াশালে গেল। এদিকে রাজার সৈন্যেরা সব যুদ্ধ করবার জন্যে হাতিয়ার নিয়ে সাজগোজ করতে লাগল।

বীরবাহু জীবনে কখনও ঘোড়ায় চড়েনি, কিন্তু এখন চড়তেই হবে—না চড়ে নিস্তার নেই। বড় বড় তেজী ঘোড়া দেখে ভয় হল, তাই সেই সব ঘোড়ার ভেতর থেকে একটা রোগা শান্ত ঘোড়া বেছে নিলে। তার পর কোন রকমে সেই ঘোড়ার পিঠে উঠে, পাশের লোকেদের বললে—আমার কোমরের সঙ্গে আর ঘোড়ার পেটের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দাও।
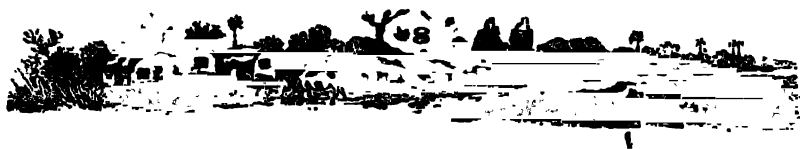
একে বীরবাহু ভাল তেজী ঘোড়া ছেড়ে রোগা ঘোড়া বেছে নিয়েছে,

বীরবাহুর কোমরের সঙ্গে বেশ করে দড়ি বেঁধে দিলে

তার পর কোমরে দড়ি বেঁধে কেউ কখন ঘোড়ায় চড়ে না। কাজেই দু-চারজন
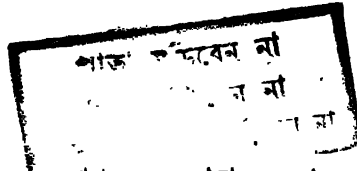
লোক হাসিঠাট্টা করতে লাগল। আবার দু-চারজন লোক বলতে লাগল, যে জ্যান্ত বাঘ ধরে আনতে পারে, সে সোজা লোক নয়। বীরবাহু ভাল ঘোড়াই বেছে নিয়েছে, আর দড়ি দিয়ে কোমর বাঁধার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

যাই হোক, সকলে মিলে ঘোড়ার পেটের সঙ্গে, আর বীরবাহুর কোমরের সঙ্গে বেশ করে দড়ি বেঁধে দিলে। তার পর বীরবাহু ঘোড়া চালাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই নড়ে না। বীরবাহু হেট্ হেট্ শব্দ করে, চাবুক মারে, কিন্তু ঘোড়া চলে না। আশপাশের লোক ঘোড়াকে ঠেলে দেয়, চাবুক মারে, কিন্তু ঘোড়া একেবারে অচল। এই ব্যাপার দেখে লোকে হাসতে লাগল, আর ঠাট্টা করতে লাগল। তাতে বীরবাহুর বড় রাগ হল, আর সে রেগে ঘোড়ার কান মলে দিলে।

এখন সেটা ছিল পক্ষিরাজ ঘোড়া। পক্ষিরাজ দুই রকম হয়, এক রকমের ডানা থাকে, আর এক রকমের ডানা থাকে না। এ ঘোড়াটা ছিল শেষের জাতের। পক্ষিরাজ ঘোড়া মারধর করলে চলে না, কিন্তু কান মুচ্‌ড়ে দিলে সওয়ার পিঠে করে শূন্য ভরে বেগে শত্রুর দিকে চলে যায়। কাজেই বীরবাহু কান মলে দিতেই, ঘোড়া শূন্যে উঠে শত্রুর দিকে যেতে লাগল। বীরবাহুর তখন যা মনের অবস্থা, তা বলে বুঝান যায় না। ঘোড়ার যাবার পথে একটা অশ্বত্থ গাছ ছিল। ঘোড়া সেই অশ্বত্থ গাছের ডালের নীচে দিয়ে যাবার সময়, বীরবাহু প্রাণপণে অশ্বত্থের একটা মস্ত ডাল আঁক্‌ড়ে ধরলে।

এখন সে ডালের গোড়াটা ছিল একেবারে ফাঁপা। ডালটা ভেঙে

পালা—পালা—পালা।

বীরবাহুর হাতের মধ্যেই রয়ে গেল

নদীর ওপারে শ্যামপুরের সৈন্যেরা তখন নদী পার হবার চেষ্টা করছিল। তারা হঠাৎ দেখতে পেলে, যে রামপুরের এক বীরপুরুষ শূন্যপথে ঘোড়ায় চড়ে একটা প্রকাণ্ড গাছ নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে আসছে। যেমন দেখা—আর অমনি—পালা—পালা—পালা। তারা ভেবেছিল, অসুর, কি দৈত্য, কি দানব আসছে। তাই যে যেখানে ছিল সকলেই প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেল। আর শত্রু পালালো দেখে, পক্ষিরাজ ঘোড়া আবার যেখান থেকে গিয়েছিল, সেইখানে ফিরে এল।

তখন সকলে ব্যস্ত হয়ে বীরবাহুর কোমরের দড়ি খুলে, তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামালে। তার পর সকলে মিলে—বীরবাহুর জয়, বীরের জয়, রামপুরের জয় বলতে বলতে তাকে রাজসভায় নিয়ে গেল। দেশময় বীরবাহুর বীরত্বের কথা ছড়িয়ে পড়ল, রাজা তাকে অনেক টাকাকড়ি দিলেন, আর সে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

হনুমানের রসভঙ্গ

পূর্ব্বে যাত্রার হনুমান নিয়ে অনেক মজার ব্যাপার ঘটতো। সেকালের হনুমান অর্থাৎ একটা লোক মুখে মুখোস দিয়ে ল্যাজ পরে যাত্রার আসরে এসে, চারিদিকে লাফালাফি কোরে, আড়গোড়ার উপরে উঠে, কলা খেয়ে হনুমানত্বের পরিচয় দিত। আজকালকার যাত্রা থিয়েটারের হনুমান অনেকটা সভ্য হয়েছে, আগেকার মত অসভ্যতা আর করে না। কাজেই সে রকম মজার ব্যাপার আর ঘটে না।

আগেকার হনুমানের একটা মজার গল্প তোমাদের বলব। কিন্তু তার

আগে যিনি বাংলাদেশে যাত্রার হনুমানকে অমর করে রেখে গেছেন, তাঁর হনুমানের কথা বলা উচিত। তোমরা বড় হয়ে ৺তারকনাথ চাটুয্যের 'স্বর্ণলতা' বলে বই পড়লে সব কথা জানতে পারবে, আমি কেবল আরম্ভটুকু বলছি।

এক জায়গায় রাম-যাত্রা হচ্ছে, কিন্তু যে হনুমান সাজে সে বেচারি অসুখে পড়েছে। কাজেই যাত্রার অধিকারী সেই দলের নীলকমল বলে একটা লোককে হনুমান সাজতে বললে। কিন্তু নীলকমল হনুমান সাজতে রাজি নয়। সে তো আর হনুমান নয়, সে যে নীলকমল। হনুমান হলে নীলকমলের অপমান হবে যে। কিন্তু অধিকারীর অনেক অনুরোধে আর মাইনে বেশী পাবার লোভে, শেষে নীলকমল হনুমান সাজতে রাজি হল। হনুমান সেজে নীলকমল যাত্রার আসরে উপস্থিত। রামচন্দ্র সেজে একটা লোক পূর্ব্বেই আসরে দাঁড়িয়েছিল। সে ডাকলে, বাছা হনুমান। হনুমান বলে ডাকতেই নীলকমলের মাথা গেল বিগড়ে। সে যোড়হাত করে দর্শকদের বললে, 'মশাইরা, আমি হনুমান নই; আমার নাম নীলকমল, বাড়ী রামনগর। আমায় জোর করে হনুমান সাজিয়েছে।' তখন আসরে হাসির ধূম পড়ে গেল।

এখন আমার হনুমানের কথা বলি।

একটা পাড়াগাঁয়ে একটা যাত্রার দল রাম-যাত্রা করবে, কিন্তু তাদের দলের যে হনুমান সাজে তার হয়েছে অসুখ। অথচ দলে এমন দ্বিতীয় লোক নেই, যাকে হনুমান সাজান যায়। অন্য সকলকেই কিছু না কিছু সাজতে হবে, অথবা গান গাইতে হবে। তাই সেই যাত্রার অধিকারী, একটা ঠিকে হনুমানের জন্যে গাঁয়ে খোঁজ করতে লাগল। শেষে রামা বাগ্দী বলে

একটা লোক আট আনা পয়সার লোভে হনুমান সাজতে রাজি হল। সে নাকি বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত পড়েছিল।

অষ্টগণ্ডা পয়সার জন্যে এ দাস ঠেঙ ভাঙতে প্রস্তুত নয়

পূর্ব্বেই বলেছি, যে সেকালের যাত্রার হনুমানকে প্রকৃত হনুমানের মত লাফালাফি করতে হতো। এইজন্যে যাত্রা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে রামা বাগ্দী বা ভাড়া করা হনুমানকে, যাত্রার আসরের পাশে একটা আম গাছে তুলে দেওয়া হয়েছিল। গাছটার গুঁড়ি প্রায় চার হাত উঁচু, তার পরে ডালপালা। রামাকে যাত্রার লোকে ধরাধরি করে গাছে তুলে দিয়েছিল বটে, কিন্তু কি করে যে সে নামবে, সে কথা কেউ তখন ভাবে নি। রামা আট আনা পয়সার সঙ্গে হনুমান সাজবার অধিকার পেয়েছে, আর এই আনন্দে সে মেতে উঠেছে। হনুমানত্বের পরিচয় দেবার জন্যে সে একেবারে গাছের মাথার উপরে উঠেছিল। মতলব এই, যে নামবার সময় লাফাতে লাফাতে নেমে খুব ভাল হনুমান হবে। এখন সেই গাছের ওপরে কাকে বাসা করেছিল, আর বাসায় ছানা ছিল। কাজেই রাজ্যের কাক এসে রামার মাথায় ঠোক্‌রাতে আরম্ভ করলে। কাকের জ্বালায় বিব্রত হয়ে রামা গাছের ওপর থেকে নেমে, নিচের ডালে বসে রইল।

যথা সময়ে যাত্রার রামচন্দ্র আসরে এসে ডাকলেন, বৎস হনুমান। কিন্তু বৎস হনুমান গাছ থেকে নামে কি করে। চার হাত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙতে পারে। তার ওপর গাছের তলায় কতকগুলো ইটপাটকেল পড়েছিল বলে, লাফিয়ে পড়বার সুবিধেও ছিল না।

এদিকে হনুমানের দেরী হচ্ছে দেখে, রামচন্দ্র আবার ডাকলেন, বৎস হনুমান। বৎস হনুমান দেখলে রামচন্দ্র যখন দুবার ডেকেছেন, তখন আর চুপ করে থাকা চলে না। কাজেই গাছের ডালে বসে হাতযোড় করে রামা বললে, রঘুনাথ, একখানি মই আনয়ন করুন, অষ্টগণ্ডা পয়সার জন্যে এ দাস ঠেঙ ভাঙতে প্রস্তুত নয়।

শুনে আসর শুদ্ধ লোক হেসে অস্থির।

ভীমনাগের সন্দেশ

গল্পটির নাম পড়ে তোমাদের মনে হবে যে সন্দেশের আবার গল্প শুনবো কি, পেলে টপাটপ্ খেয়ে ফেলি। তা সন্দেশ এমনি সুখাদ্যই বটে।

সন্দেশ কেবল সুখাদ্য নয়, বাংলার নিজস্ব জিনিস। বাংলা ছাড়া সন্দেশ পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। পশ্চিম অঞ্চলে বা উড়িষ্যা দেশে সন্দেশ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেও বাঙালি কারিকরের হাতের তৈরি। তবে এখন দু চার জন হিন্দুস্থানী কি উড়িয়া বাঙালির কাছ থেকে সন্দেশ তৈরি করা শিখেছে বটে, কিন্তু তাদের সন্দেশ বাঙালির তৈরি সন্দেশের মত ভাল হয় না। আর ভীম নাগের সন্দেশের সঙ্গে তাদের তৈরি সন্দেশের তুলনাই হয় না।

তোমরা মনে করতে পার, যে ভীম নাগেরা বুঝি আমাকে অমনি সন্দেশ খেতে দেয়, তাই তাদের সন্দেশের সুখ্যাত করছি। কিন্তু বাস্তবিক

তা নয়। আমি ভীম নাগের সন্দেশ খেয়েছি বটে, কিন্তু রীতিমত দাম দিতে হয়েছে। পয়সা না দিলে তারা সন্দেশ দেয় না।

যাক সে কথা। ভীম নাগের সন্দেশের জন্যে সে একটা মজার কাণ্ড ঘটেছিল, সেই গল্পটা তোমাদের বলছি।

হরিহর মুখুয্যে কলকাতার একটা আপিসের বড়বাবু। তিনি মাইনে পান তিন শো টাকা, দেশেও বেশ জমিজমা আছে। কাজেই হরিহর বাবুর অবস্থা ভালই বলতে হবে।

হরিহর বাবুর বাড়ী রাজসাহী জেলায়, নাটোর থেকে কিছু দূরে। নাটোরের সন্দেশ ভাল বলে, কাজকর্ম্মের সময় হরিহর বাবু নাটোর থেকে সন্দেশ আনাতেন। সেই সন্দেশ খেয়ে তাঁর প্রতিবাসীরা বলতেন, যে নাটোরের মত সন্দেশ আর কোথাও হয় না। কিন্তু হরিহর বাবু কলকাতার ভীম নাগের সন্দেশ খেয়েছেন, তিনি বলতেন, ভীম নাগের সন্দেশের চেয়ে ভাল সন্দেশ আর হয় না। এই নিয়ে প্রতিবাসীদের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সেই থেকে হরিহর বাবুর ইচ্ছে ছিল, যে একবার ভীম নাগের সন্দেশ এনে তাঁর দেশের লোকদের খাওয়াবেন।

পূজোর ছুটি। যার যেমন অবস্থা, কেউ পশ্চিমে বেড়াতে যাচ্ছে, কেউ দার্জিলিঙে যাচ্ছে, কেউ বা নিজের দেশে চলেছে। হরিহর বাবুও পূজোর ছুটিতে দেশে চলেছেন। দেশের লোকদের খাওয়াবেন বলে, এবার তিনি অনেক ভীম নাগের সন্দেশ সঙ্গে নিয়েছেন।

সন্দেশ চির দিন শালপাতায় যেতো, কিন্তু এখন আর যায় না। যাত্রার হনুমান যখন সভ্য হয়েছে, তখন ভীম নাগের সন্দেশই বা সভ্য হবে না কেন। সেই জন্যে সভ্য সন্দেশ এখন কাগজের বাক্সে যান, আর রসগোল্লা যান টিনের কৌটায়। হরিহর বাবুর সঙ্গের সন্দেশগুলিও কাগজের বাক্সে ভরা ছিল।

হরিহর বাবুর বাড়ী যেতে হলে প্রথমে রেলে, তার পরে ষ্টিমারে যেতে হয়। প্রায় সন্ধ্যার সময় হরিহর বাবু ষ্টিমার থেকে নামলেন। ষ্টেশন থেকে তাঁর বাড়ী প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। বাড়ী থেকে লোকজন আর গাড়ী পাল্কী আসবার কথা ছিল। কিন্তু হরিহর বাবু নেমে দেখলেন যে তখনও লোকজন, গাড়ী, পাল্কী কিছুই আসে নি। কাজেই তাঁকে অপেক্ষা করতে হল।

যে ষ্টেশনে তিনি নেমেছিলেন সেটা ষ্টেশন বটে, কিন্তু বাড়ী ঘর সেখানে কিছুই নেই। ষ্টিমার আসবার কিছু পূর্ব্বে সেখানে ষ্টেশন-মাষ্টার এসে টিকিট বিক্রী করে, লোক নামলে তাদের টিকিট নেয়, তার পরে বাড়ী চলে যায়।

হরিহর বাবু ষ্টিমার থেকে নামবার পরেই যাত্রীরা আর ষ্টেশন-মাষ্টার চলে গেল। হরিহর বাবু চাকর বাকর আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে সেইখানে বসে রইলেন। সঙ্গে অনেক জিনিস-পত্র ছিল। চাকরেরা সেই সব জিনিষ-পত্র বেশ গুছিয়ে রেখে দিলে।

হরিহর বাবু যেখানে বসেছিলেন, তার দক্ষিণ দিকে নদী, উত্তর দিকে মাঠ আর পশ্চিম দিকে গভীর বন। সেই বনে অনেক হিংস্র জন্তু থাকে।

যাবার সময় এক বাক্স ভীম নাগের সন্দেশ নিয়ে গেল

হরিহর বাবু আসবার কিছু পরেই, সেই বন থেকে একটি

ভালুকের ছানা এসে হরিহর বাবুর জিনিষ-পত্রগুলি ঘাটতে লাগল। হঠাৎ তার কাণ্ড দেখতে পেয়ে, হরিহর বাবুর একটি চাকর তাকে তাড়া দিলে। তাড়া খেয়ে ভালুকের ছানাটি ভয়ে পালিয়ে গেল, কিন্তু যাবার সময় এক বাক্স ভীম নাগের সন্দেশ নিয়ে গেল।

** ** **

যেখানে হরিহর বাবু ষ্টিমার থেকে নেমেছিলেন, সেই অঞ্চলে কতকগুলি ডাকাতের বাস ছিল। তারা কখন নৌকো করে, কখন পায়ে হেঁটে ডাকাতি করতো। হরিহর বাবুর আসবার সন্ধান পেয়ে, এক দল ডাকাত বনের কিছু দূরে নৌকো করে এল; তার পর নৌকো থেকে নেমে বনের ভেতর দিয়ে হরিহর বাবু যেখানে বসে আছেন, সেই দিকে চলল। বনের ভেতর থেকে বার হয়ে ডাকাতেরা দেখলে, হরিহর বাবুর অনেক জিনিষ সাজান রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন কিছু লেখাপড়া জানতো। সে দেখলে কতকগুলো বাক্সে ভীম নাগের সন্দেশ লেখা রয়েছে। সে বললে, ভাই সব, ভীম নাগের সন্দেশের নাম শুনেছি, কখন খাইনি। আগে সন্দেশ খেয়ে নিই, তার পরে ডাকাতি করবো। ভীমনাগের সন্দেশের লোভে কেউ কেউ তার কথায় রাজি হল বটে, কিন্তু অনেকেই বিষম আপত্তি করলে। কিন্তু যারা রাজি হয়েছিল, তারা সন্দেশ খেতে আরম্ভ করেছে আর বলছে— আঃ! কি চমৎকার! কাজেই যারা সন্দেশ খেতে রাজি হয় নি, তারাও

একটু মুখে দিয়ে দেখলে। কিন্তু মুখে দিতেই তাদের মত বদলে গেল। তারা বললে—ভাই সব পেটের দায়েই ডাকাতি করি। তা আগে এ অমৃত খাই, তার পরে ডাকাতি। এই বলে সব ডাকাতরা মিলে সন্দেশ খেতে আরম্ভ করলে। হরিহর বাবু অবাক হয়ে তাদের কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

** ** **

* * *

এদিকে সেই ভালুকের ছানাটি এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে ভালুকের দলে মিশল। সে দলটাতে ছোট বড় ১০।১২টা ভালুক ছিল। ছানার হাতের সেই বাক্স থেকে সব ভালুকেরাই একটু একটু সন্দেশ খেলে। আঃ! কি চমৎকার!

সন্দেশ ফুরিয়ে গেলে ভালুকেরা ছানাটাকে ইসারা করলে, এমন চমৎকার জিনিষ যেখানে পেলি, সেখানে আমাদের নিয়ে চল। ভালুক-ছানা সেটা বুঝতে পেরে যেখান থেকে সে সন্দেশ পেয়েছিল, সেখানে তাদের নিয়ে চলল।

পূর্ব্বেই বলেছি, যে ডাকাতেরা সন্দেশ খেতে আরম্ভ করলে, কিন্তু আরম্ভ মাত্র। ভালুকেরা যখন দেখতে পেলে যে তাদের লোভের জিনিষ মানুষে খাচ্ছে, তখন তাদের খুব রাগ হল, আর তারা ছুটে এসে সেই ডাকাতদের আক্রমণ করলে। ডাকাতেরা এই ভালুকের দল দেখে সন্দেশ ফেলে প্রাণভয়ে ছুটে পালাল।

ভীমনাগের

তখন ভালুকেরা এসে সেই সন্দেশের ওপর পড়ল, কিন্তু আর ভাল করে সন্দেশ খাওয়া হল না। কেননা তখন হরিহর বাবুর লোকজন এসে পড়েছে, আর এসে ভালুকের দল দেখেই তারা বন্দুকের আওয়াজ করতে লাগল। বন্দুকের আওয়াজ শুনে ভালুকদের সন্দেশ খাবার চেষ্টা উড়ে গেল। ভীম নাগের সন্দেশ হয়তো আবার মিলতে পারে, কিন্তু প্রাণটি গেলে তো আর মিলবে না। তাই তারা প্রাণের ভয়ে বনের মধ্যে লয়ে গেল

* *　　* *　　* *

আমাদের দেশে নিয়ম আছে, যে মিষ্টি খেয়ে খাওয়া শেষ করতে হয়। ? পেটের খোরাক, আর গল্প মনের খোরাক। তাই উৎকৃষ্ট মিষ্টির গল্প ই এই বই হল

ছেলেরা গল্প শোনবার সময়, যে গল্প বলে সে যদি থামতে, তা হলে জিজ্ঞাসা করে

তার পর?

আর হুড়োহুড়ি বইখানি পড়তে পড়তে যখন সব গল্প ফুরিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পার

তার পর?

তার পর পূজার পূর্ব্বে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের হাসির গল্প কুড়িয়ে তোমাদের উপহার দেব। আরও দেব আমাদের নিজের দেশের ... ছোট ছোট গল্প। সে গল্প পড়ে তোমরা বেশ আমোদ ... এমন কতকগুলি উপদেশ পাবে যাতে তোমাদের বুদ্ধি ...। শুধু তাই নয়, সে উপদেশগুলি অনেক সময়ে সংসারের বিপদ ... তোমাদের রক্ষা কোরবে। সে বইটার নাম কি জান? ... কে লিখেছেন জান? শ্রীদক্ষিণাচরণ ভট্টাচার্য্য।